হজ্জে মাবরুরের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয় - আল-হাদীস

বাইতুল্লাহ্‌র মেহমান

গ্রন্থনা
ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

সম্পাদনা পরিষদ
মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী
মুফতি মাওলানা নোমান সিদ্দীক
মাওলানা নিজামুদ্দীন
মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী
আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার পয়েন্ট, সিলেট।

বাইতুল্লাহ্‌র মেহমান

গ্রন্থনা
ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

সম্পাদনা পরিষদ
মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী
মুফতি মাওলানা নোমান সিদ্দীক
মাওলানা নিজাম উদ্দীন রানাপিংগী
মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার পয়েন্ট, সিলেট।
০১৭১৭ ৯২৯ ৬৭৫

প্রথম প্রকাশঃ শাওয়াল ১৪৩২, সেপ্টেম্বর ২০১১।

দ্বিতীয় সংস্করণঃ শাওয়াল ১৪৩৩, সেপ্টেম্বর ২০১২।

প্রকাশকঃ মুহাম্মদ মুখলিছুর রহমান ও মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
নিবাস - বি/৯, পশ্চিম পাঠানটুলা, সিলেট।

বর্ণবিন্যাসঃ গ্রন্থকার

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণঃ দি কাসওয়া কম্পিউটার, ০১৭১১ ৪৭৮ ২৪৪।

প্রাপ্তিস্থানঃ
জামিয়া রাব্বানিয়া, গদিরাশী, জকিগঞ্জ, সিলেট।
মোঃ ০১৭৩৭ ৯১৩ ৪৬৩।
হুসাইনিয়া কুতুবখানা, কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।
মোঃ ০১৭১৪ ৭০৪ ৬৫৬।
মূল্যঃ ৳৮০.০০ টাকা

"Baitullahr Mehman" [Guest of Baitullah] by Engineer Azizul Bari, Published by Khanqa-e-Aminia-Asgaria, Date of Publishing: September 2012. Price: ৳80.00; $5.00; £3.00

উৎসর্গ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর প্রতি -
তাঁদের আদর্শ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা গোটা মুসলিম উম্মাহকে আলোকিত করুন।

মুজাহিদে মিল্লাত কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দিন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ওয়ালিদে মুহতারাম হাজী আলী আসগর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতি -
আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দরজা বুলন্দ করুন।

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা হজ্জ করেন নি এবং যারা হজ্জ পালনের সংকল্প করেছেন, তাদের প্রতি এই ক্ষুদ্র তুহ্‌ফা! আল্লাহ তা'আলা সবাইকে হাজ্জে মাবরুর নসীব করুন।

-গ্রন্থকার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلٰوة والسلام علٰى سيد المرسلين واله واصحابه اجمعين

আমাদের আরজ

পবিত্র হজ্জ সম্পর্কিত সর্বাপেক্ষা হাল-নাগাদ তথ্যবহুল একটি কিতাব পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি। আমরা আশা করছি শুধু হজ্জে গমনেচ্ছু নয়, সকল অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই গ্রন্থটি থেকে উপকৃত হবেন। লেখক ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী হজ্জের মৌলিক সকল বিষয়বস্তু অত্যন্ত সরল ভাষায় তুলে ধরেছেন। এছাড়া পাঠকদের উপহার দিয়েছেন হজ্জের এক অপূর্ব ভ্রমণবৃত্তান্ত। হৃদয়াকর্ষক এই কাহিনী পাঠ করে যে কোন মনে পবিত্র বাইতুল্লাহ্‌র মেহমান হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কিতাবে উল্লেখিত হজ্জ ও উমরাহ সম্পর্কিত যাবতীয় শরঈ বিধান সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক খুব সতর্কতাসহ পরীক্ষা করা হয়েছে।

আমরা **'খানকায়ে-আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী'** থেকে হজ্জের একখানা সঠিক তথ্যবহুল কিতাব প্রকাশের চেষ্টা করেছি। এটা গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। ক্রুটিমুক্ত রাখার জন্য বারবার প্রুফ দেখে সংশোধন করেছি। এরপরও কারো চোখে ভুল-ক্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানিয়ে বাধিত করবেন, এই অনুরোধ জানাচ্ছি। আগামী সংস্করণে তা শোধরে দেবো, ইনশা-আল্লাহ।

গ্রন্থ প্রকাশ বেশ ব্যয়বহুল ও পরিশ্রমের কাজ। সুহৃদ **জনাব মুহাম্মদ মুখলিছুর রহমান ও জনাব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম** সাহেবদ্বয় গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্কণের মুদ্রণ খরচ অনুদান হিসাবে প্রদান করেছেন। আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাদের অর্থদানকে কবুল করুন। এছাড়া 'বাইতুল্লাহ্‌র মেহমান'র এ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে লেখকসহ অন্যান্য যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন আমরা তাঁদের প্রতি ঋণী। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

সম্পাদনা পরিষদ
খানকায়ে-আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ
শাওয়াল ১৪৩২ হিজরী।

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ

উপদেষ্টামণ্ডলী ও সূরার সদস্যবৃন্দ

উপদেষ্টামণ্ডলী

খলিফায়ে কুতবে আলম হযরত মাদানী রাহ.
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নোমান চট্টগ্রমী দা.বা.

মাসিক মদীনা সম্পাদক
হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান দা.বা.

খলিফায়ে হযরত মাওলানা আবদুল করীম শায়খে কৌড়িয়া রাহ.
শাইখুল হাদীস মাওলানা মুক্বাদ্দাস আলী দা.বা.

খলিফায়ে ফিদায়ে মিল্লাত হযরত আসআদ মাদানী রাহ.
হাজী মাওলানা ইমদাদুল্লাহ আমিনী, সাহেবজাদায়ে কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহ.

সূরার সদস্যবৃন্দ

১. মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী (সভাপতি) ২. সাহেবজাদায়ে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহ. ক্বারী উবায়দুল্লাহ আমিনী (সহ-সভাপতি) ৩. মুফতি মাওলানা নোমান সিদ্দীক (সহ-সভাপতি) ৪. ইঞ্জিনিয়ার শায়খ আজিজুল বারী (সদস্য সচিব) ৫. মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান (সহকারী সদস্য সচিব) ৬. শায়খুল হাদীস মাওলানা আরশাদ ৭. মুহাদ্দিস মুফতি মাওলানা জাকারিয়া ৮. মুহাদ্দিস মাওলানা শরীফ উদ্দীন বসন্তপুরী ৯. মাওলানা শায়খ আব্দুল মতিন নবীগঞ্জী ১০. মাওলানা শায়খ নাজমুদ্দীন কাসিমী, ১১. উস্তাযুল হাদীস শাহ ফরিদুদ্দীন জালালাবাদী ১২. মাওলানা শায়খ মুশতাক আহমদ খান ১৩. প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক ১৪. অধ্যাপক ডাক্তার আবদুল হক ১৫. মুফতি মাওলানা মনজুর রশীদ আমিনী ১৬. মাওলানা নিজাম উদ্দীন রানাপিংগী ১৭. উস্তাযুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ আতাউর রহমান জকিগঞ্জী ১৮. মাওলানা সিরাজুল ইসলাম ১৯. মাওলানা সালমান আহমদ ২০. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ২১. কবি আবদুল মুকিত মুখতার ২২. শায়খ ইমদাদুল আমীন চৌধুরী ২৩. হাফিজ ফুজাইল আহমদ চৌধুরী মিশকাত ২৪. হাফিজ সৈয়দ মানসুরুল হাসান ২৫. হাফিজ এনামুল হক ২৬. হাফিজ মাওলানা কামরুজ্জামান ২৭. শাহিদ হাতিমী।

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ
আলী সেন্টার, সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।
০১৭৩৭ ৯১৩৪৬৩ / ০১৭৩২ ৪৯৮ ২৮৮ / ০১৭১৭ ৯২৯ ৬৭৫

সূচিপাতা

পরিচ্ছেদ ১

হজ্জ ও উমরার ফজিলত

পবিত্র হজ্জ ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম একটি। অন্য চারটি হলো তাওহিদের বিশ্বাস (কালিমা), নামায, রোযা ও যাকাত। হজ্জ হচ্ছে শারীরিক, আত্মিক ও মালী একটি ইবাদত। সামর্থবান, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, বালিগ মুসলমানের ওপর জীবনে একবার মাত্র হজ্জ পালন ফরয। আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

-“নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হিদায়াত ও বরকতময়। এতে রয়েছে মাকামে ইব্রাহীমের মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন, আর যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর এ ঘরের হজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না, আল্লাহ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না।” (সূরা আলে ইমরান (৩) : ৯৬-৯৭)

অন্য আয়াতে আছে: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ - “এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের জন্যে ঘোষণা প্রচার কর।” (সূরা হাজ্জ (২২) : ২৭)

পবিত্র হাদীস শরীফে আছে:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا

-"হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ভাষণ দেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য হজ্জ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জ পালন করো।" (সহীহ মুসলিম)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللّٰهِ فِيْ الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلٰى ظَهْرِ بَعِيْرِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُجِّيْ عَنْهُ

-"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, খাছআ'ম গোত্রের একজন মহিলা এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলেন, আমার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ, তাঁর উপর হজ্জ ফরয। কিন্তু উঠের পিঠে বসার মত তাঁর শারীরিক কোন শক্তি নেই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ পালন করো।" (সহীহ বুখারী, মুসলিম)

হজ্জের ফজিলত কতো বিরাট তা ভাষায় বর্ণনা আদৌ সম্ভব নয়। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আমরা এখানে সহীহ হাদীস শরীফ থেকে কয়েকটি রিওয়ায়েত তুলে ধরছি।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ-

-"হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন প্রশ্ন করা হলো, কোন্ আমলটি শ্রেষ্ঠ? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা

হলো, এরপর কোন্‌ আমল? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আবার প্রশ্ন করা হলো, এরপর কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, হজ্জে মাবরুর (গ্রহণযোগ্য হজ্জ)।” [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

-“হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুই উমরাহর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহর কাফ্‌ফারা (মোচনকারী) হলো এই দুই উমরাহ। আর হজ্জে মাবরুরের বদলা একমাত্র বেহেশত ছাড়া আর কিছু নয়।” [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

-“হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যাক্তি বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করলো, হজ্জের মধ্যে সহবাস ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রইলো এবং গোনাহ থেকে মুক্ত থাকলো, সে ঐ দিনের মতো এমন বে-গোনাহ হয়ে ফিরলো, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন।” (সহীহ বুখারী)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُنْزِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ رَحْمَةٍ يَنْزِلُ عَلٰى هَذَا الْبَيْتِ سِتُّونَ لِلطَّائِفِينَ، وَأَرْبَعُوْنَ لِلْمُصَلِّيْنَ، وَعِشْرُوْنَ لِلنَّاظِرِيْنَ

-“হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা’আলা প্রত্যেকদিন কাবা শরীফে ১২০টি রাহমাত নাজিল করেন। এরমধ্যে ৬০টি হলো তাওয়াফকারীদের

জন্য, নামায আদায়কারীদের জন্য ৪০টি এবং কাবা শরীফের দৃষ্টিপাতকারীদের জন্য ২০টি রাহমাত।" (তাবারানী: ১১৩১৩)

হযরত আবু উমামাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا

-"যে ব্যক্তি বাহ্যিক কোন প্রয়োজনের কারণে, বা কোন জালিম বাদশাহ্‌র বাধাবিঘ্ন কিংবা কোন রোগশোক দ্বারা বাঁধাপ্রাপ্ত না হয়েও হজ্জ পালন করলো না, সে মারা যাবে চাহে তো ইয়াহুদী কিংবা নাসারা হয়ে।" (মিশকাত, দারামী)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ

-"হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বাইতুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকে ঘুরে তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যখানে দৌড়ানো এবং মিনায় জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা দ্বারা আল্লাহর জিকির (এবং আল্লাহর মাহাব্বাত) তাজা হয়।" [আবু দাউদ শরীফ]

পরিচ্ছেদ ২

হজ্জের ভ্রমণ ও ব্যক্তিগত অনুভূতি

পবিত্র হজ্জের ভ্রমণ হচ্ছে শারীরিক, আত্মিক ও মানসিক একটি অভিজ্ঞতা। লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক- অর্থাৎ আমি হাজির! হে আল্লাহ্ আমি হাজির- বলে এর শুরু এবং তাওয়াফ, সাঈ, মিনা, আরাফাত, মুজদালিফা, জামারাত, কুরবানী, মাথা-মুণ্ডন, তাওয়াফে জিয়ারত, তাওয়াফে বিদার মাধ্যমে এর শেষ। বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় থেকেই হজ্জযাত্রীদের মানসিক ও আত্মিক অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। বস্তুত পবিত্র হজ্জ এমন একটি অভিজ্ঞতা যা একমাত্র হজ্জ পালনকারী ছাড়া কেউ জানে না। এবার পাঠকদের সামনে আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, অনুভূতির দিক থেকে সবচেয়ে অপূর্ব এবং আত্মিক দিক দিয়ে সন্তুষ্টিপূর্ণ এই ভ্রমণ কাহিনী যেটুকু সম্ভব তা তুলে ধরছি।

পূর্বকথা

আজ থেকে একুশ বছর পূর্বে, ১৯৯১ ঈসায়ী মনে আমার মরহুম আব্বাজান হাজী আলী আসগর আমাকে হজ্জ পালনের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন যেন এই দীর্ঘকাল যাবৎ আমি তাঁর নির্দেশ পূর্ণ করতে পারি নি। বস্তুত এই যাত্রার জন্য শুধুমাত্র নিয়তই যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে হুকুম না আসলে হয় না। জীবনে কত লোককে দেখেছি যারা হজ্জে যাবেন যাবেন বলে শেষ নিঃশ্বাস ছেড়ে চিরদিনের জন্য পরপারে পাড়ি দিয়েছেন, কিন্তু হজ্জপালন নসীবে জুটে নি। আলহামদুলিল্লাহ! বিলম্বে হলেও এ অধমকে আল্লাহ্ পাক হজ্জ নসীব করেছেন। এজন্যে অবশ্যই তাঁর পবিত্র দরবারে শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না।

হাজীরা হচ্ছেন আল্লাহ্‌র মেহমান। আল্লাহ্ পাক যখন কোন বান্দাহ্‌কে তাঁর পবিত্র ঘরের তাওয়াফ, আরাফাতে অবস্থান এবং অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিয়ে মাগফিরাত প্রদান করতে ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি তাকে হজ্জ পালনের জন্য নিমন্ত্রণ জানান। এই নিমন্ত্রণ হজ্জে যাত্রার আগেই অনেকে স্বাপ্নিক বা অন্য কোন উপায়ে জানতে পারেন বলেও বর্ণিত হয়েছে। আমি অবশ্য সেরূপ কোন ইঙ্গিত পাওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হতে পারি নি। এহেন যোগ্যতাসম্পন্ন শুধু তাঁরাই, যাঁরা প্রভুর খাস বান্দাহ তথা বন্ধুজন। আর আজকের জামানায় এদের সংখ্যা অতি নগণ্য। তবে হজ্জপালন তো একটি ফরয। যাদের আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য আছে

তাদেরকে হজ্জব্রত পালন করতেই হবে। সুতরাং খালিস নিয়ত হলে- আমার বিশ্বাস আল্লাহ্ পাকও তা কবুল করেন এবং হজ্জে গমনের রাস্তা খুলে দেন। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে হজ্জ-পালনের তাওফিক দিন।

ভ্রমণবৃত্তান্ত: ইহরাম পরা থেকে বাইতুল্লাহ্ দর্শন

এ বছর আমাদের কাফেলায় সর্বমোট ৩৭ জন ছিলাম। কাফেলার প্রধান ছিলেন ক্বারী উবায়দুল্লাহ্ আমিনী, সাহেবজাদা কুতবে যামান শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হজ্জে দলবদ্ধভাবে যাওয়ার মধ্যে একাধিক সুফল আছে। এ ব্যাপারে পাঠকরা এ লেখা পাঠের পর নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়া আমরা যারা এই প্রথমবারের মতো হজ্জে গিয়েছিলাম তাদের জন্য এই কাফেলা-ভিত্তিক ভ্রমণ অবশ্যই সৌভাগ্যের কারণ ছিলো। আগামীতে যারা প্রথমবারের মতো হজ্জে যাবেন আমি তাঁদেরকে এরূপ কোন কাফেলার সঙ্গে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি।

যা হোক, হজ্জ শুরুর চারদিন পূর্বে অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ সোমবার আমরা লন্ডন হিথরো থেকে রয়েল জর্ডানিয়ান বিমানযোগে সৌদির পথে যাত্রা করি। কাফেলার লীডারসহ আমরা কয়েকজন ক্বিরান হজ্জ পালনের নিয়ত করেছিলাম। এরফলে সোমবার আছরের নামাযের পূর্বে সবাইকে জর্দানের রাজধানী আম্মান এয়ারপোর্টে ইহরাম বাঁধতে হলো। ক্বিরানকারীদের এই ইহরাম দীর্ঘ আট দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। সুতরাং ইহরাম অবস্থায় এর যাবতীয় বিধি-নিষেধ আমাদের মেনে চলতে হয়েছে। কাফেলার অনেকেই আবার তামাত্তু হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধেন। তাঁরা মক্কা শরীফ পৌঁছে উমরা (তাওয়াফ, সাঈ ও মাথা মুণ্ডন) সেরে হালাল হয়ে যান (ইহরাম ছেড়ে দেন)।

জীবনের প্রথম ইহরাম বাঁধার পরই আমার নিজের মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তন অনুভূত হলো। সারাজীবন সাধারণ কাপড়-চোপড় পরিধান করে এই দু'টুকরো সেলাইহীন শ্বেত-বস্ত্র পরেই মনে হলো, আমি তো এক সাধারণ মাটির মানুষ বৈ আর কিছু নয়! পায়ে চপ্পল, মাথা উন্মুক্ত এই মানুষটি কে? কোথায় তার বাড়ি এবং কোথায় তার যাত্রা? এসব প্রশ্ন এসে আমাকে আড়ষ্ট করে দিলো। দু' রাকআ'ত নামায আদায় করে লাব্বায়িক পাঠ করলাম। যতো সময় যাচ্ছিলো ততো আমি অতীত জীবন থেকে গাফিল হচ্ছিলাম। কেন এমনটি হলো আমি জানি না। শেষ পর্যন্ত আমি ভাবলাম, হ্যাঁ আমি তো মৃত! আমি কাফন পরেছি, আর কাফন একমাত্র

মৃতরা পরে। এবার শুরু হলো বাইতুল্লাহ শরীফে পৌঁছে যাওয়ার এক তীব্র হাহাকার। আমরা বিমানে এসে আরোহণ করলাম। পথটি যেনো দীর্ঘ। তবে বাস্তবে মাত্র এক ঘণ্টা পয়তাল্লিশ মিনিটের রাস্তা। রাতের ফ্লাইট। জানালা দিয়ে বার বার তাকাচ্ছি। কবে দৃষ্টিতে পড়বে জিদ্দা শহরের বিদ্যুৎ-বাতি।

আমাদের পাশেই একদল বিদেশী। মনে হচ্ছিল কোন আরব দেশের লোকজন। এদের সবাই বেশ চিৎকার করে পড়ছিলেন, **'লাব্বায়িকা আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক, লাব্বায়িকা লা শারীকা লাকা লাব্বায়িক। ইন্নাল হামদা, ওয়ান্নি'মাতা, লাকা ওয়াল মুল্‌ক। লা শারীকা লাক'**। আমরাও অনেকে তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে পড়তে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে পড়ার পর এক ভদ্রলোক এসে বললেন, "ভাইসব! আমরা এখনও মীক্বাত পার হই নি। আপনারা লাব্বায়িক এখন এতো জোরেসুরে পড়ার প্রয়োজন নেই। মীক্বাত পার হলেই ক্যাপ্টেন আমাদেরকে অবগত করবেন। তখন আপনারা এভাবে লাব্বায়িক পাঠ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌"। তার কথায় সবাই থেমে গেলেন। এরপর আমরা মনে মনে দরূদ শরীফ এবং জিকির আজকার করতে লাগলাম। এসময় একটি অনুভূতি আমার মনে হানা দিলো।

আমি যে আজ হজ্জে গমনের জন্য ইহরাম পরেছি, তা কিভাবে সম্ভব হলো? এ মহান যাত্রার জন্য যিনি আজ আমাকে ইহরাম পরিয়েছেন সেই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা মনের মধ্যে জাগ্রত হতেই চোখ দু'টো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। হৃদয়টা হঠাৎ যেন বরফের হীম-শীতল ঠাণ্ডা জলে ভিজে গেল। কী অপূর্ব সে অনুভূতি! আমার ৪৩ বছরের জীবনে কখনও এরূপ অদ্ভুত অনুভূতির চেতনা জাগ্রত হয় নি। অনেকক্ষণ মহান আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম। বললাম, হে আল্লাহ্‌! এই নরাধম নিমকহারাম গোনাহগারকে আজ তুমি পবিত্রভূমির দিকে নিয়ে যাচ্ছ, তোমার ঘরের মেহমান হিসেবে দাওয়াত করেছো, তার জন্য কী উপায়ে যে তোমায় ধন্যবাদ দেবো সে ভাষা আমার জানা নেই। প্রভুগো! দাওয়াত যখন দিয়েছো তখন সত্যিই তোমার ঘরের সামনে পৌঁছে আমার হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটাও। তোমার প্রিয় হাবীবের রওযা শরীফের সামনে নিয়ে একবার প্রাণ খুলে বলার সুযোগ দাও- **"আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!"**

বিমানের ছোট্ট জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় চোখে পড়লো জিদ্দা নগরীর উজ্জ্বল বিদ্যুৎ বাতির ঝলক। কিছুক্ষণ পরই পাইলট জানালেন,

আমরা বিশ মিনিটের মধ্যেই জিদ্দাস্থ বাদশাহ্ আব্দুল আজিজ বিমানবন্দরে অবতরণ করছি। সিটবেল্ট পরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

স্থানীয় সময় রাত এগারোটায় আমাদের বিমানটি সৌদির মাটিতে টাচ্-ডাউন করলো। বারবার পড়তে লাগলাম, আল-হামদুলিল্লাহ! অন্তত পবিত্রভূমির দেশের মাটিতে আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে সহি সালামতে পৌঁছিয়েছেন। হে আল্লাহ্! এবার আমাদেরকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বাইতুল্লাহর শহর, পৃথিবীর পবিত্রতম নগরী মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌঁছে দাও।

হজ্জে যাত্রার আগে অনেকের কাছেই শুনেছি, জিদ্দার টার্মিনাল পার হয়ে বাসে চড়ে মক্কা শরীফের দিকে যাত্রাটিই হচ্ছে হাজীদের জন্য সর্বপ্রথম ধৈর্য পরীক্ষা। কেউ কেউ একথাও বলেছেন, এটাই প্রথম পুলসিরাত! এখানে ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লাগে। কিন্তু আমাদের বেলা এর ব্যতিক্রম ঘটলো।

আমরা বিমান থেকে নেমে একটি বাসে আরোহণ করলাম। টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের ২নং কক্ষে আমাদেরকে নেওয়া হলো। ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলাম সমস্ত কক্ষটি প্রায় জনশূন্য। আমাদের কাফেলার মুদির (প্রধান পরিচালক) ক্বারী উবায়দুল্লাহ বললেন, একি! সমস্ত কক্ষ শূন্য! আল-হামদুলিল্লাহ! তা'ল! সুরা'! সবাই তাড়াতাড়ি আসুন।

আমরা সবাই পরবর্তী কক্ষ অর্থাৎ ইমিগ্রেশন কক্ষে ঢুকার জন্য লাইন ধরলাম। মুদির সাহেব আশ্চর্য হয়ে কক্ষটি শূন্য কেন বলেছিলেন তা একটু পরই খেয়ালে আসলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই কোত্থেকে অন্তত কয়েক হাজার লোক এসে কক্ষে ঢুকে পড়লেন। তবে ভাগ্যিস! আমরা এদের পেছনে না পড়ে অগ্রে ছিলাম। ঘণ্টা খানেক এখানে দাঁড়ানোর পর আমাদেরকে ভেতরে নেওয়া হলো। মহিলাদের প্রবেশ পথ আলাদা। তাদেরকে আগেই ভেতরে প্রবেশ করিয়ে ইমিগ্রেশন সেরে অপরপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হলো। আমরা আরও ঘণ্টা খানেক পরই ইমিগ্রেশন পার হয়ে গেলাম। ইমিগ্রেশনে তেমন কিছু প্রশ্ন কেউ করেন নি। তবে সবার হাতের লাগেজ খুলে পরীক্ষা করা হলো। আর পাসপোর্টগুলো অফিসারের সীলের প্রচণ্ড চাপে কিছুটা হাহাকার করেছে মাত্র! এতো জোরে কোথাও কাউকে সীল মারতে দেখি নি। এই হলো আমাদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। মাত্র দু'তিন ঘণ্টার ভেতর জিদ্দার পুলসিরাতের প্রথমাংশ পার হয়ে গেলাম, অথচ অনেকের কাছে পরে জেনেছি, এই ইমিগ্রেশন পার হতেই কেউ কেউ ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন। আমাদের বেলা এই দয়া

আল্লাহ্‌র খাস্‌ রাহমাত বলেই আমি মনে করি এবং এর পেছনে রহস্যটা কি তা সময়মতো বলবো ইনশাআল্লাহ্‌।

কাফেলায় ছিলাম আমরা ৩৭ জন। তবে একটি বাসের জন্য প্যাসেঞ্জার প্রয়োজন ৫৫ জনের। যে কোন বাস অবশ্য পুরো না হলে ছাড়বে না। আমাদের কাফেলার প্রধান এ ব্যাপারে একটি ফন্দি আঁটলেন। প্যাসেঞ্জার সংখ্যা বৃদ্ধির খোঁজ করতে লাগলেন। কয়েকজন মিলেও গেলো। অবশ্য সবাইকে বৃটেন থেকে আগত হতে হবে। সৌদি কর্তৃপক্ষ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে আগতদের জন্য এক একটি আলাদা নাম্বার সিস্টেম করে রাখেন। যেমন পশ্চিম ইউরোপের জন্য বেশ ক'টি সংখ্যা নির্ধারিত আছে। আমাদের সংখ্যাটি ছিলো ২৬। এটাকে মুয়াল্লিম নাম্বার বলে। সমগ্র হজ্জ ভ্রমণে এই নাম্বারটি আমাদের জন্য ছিলো জরুরী। যা হোক, ঘণ্টা দু'এক পরে আমাদের বাস মক্কা মুয়াজ্জমার পথে ছেড়ে দিলো। ইতোমধ্যে টার্মিনাল বিল্ডিংয়ে স্থাপিত নামাযের স্থানে আমরা ইশার নামায পড়ে নিলাম।

৩ থেকে ৪ ঘণ্টার বাস-ভ্রমণ। আসলে দূরত্ব বেশি নয়- ৪২ মাইল মাত্র। কর্তৃপক্ষ বাস পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি নিয়ম করে নিয়েছেন। কারণ এক সাথে সব বাস যদি মক্কা শরীফ ও এর আশে-পাশে গিয়ে পৌঁছে যায় তাহলে বিরাট যানজটের সৃষ্টি হবে। সুতরাং আস্তে আস্তে বিভিন্ন স্থানে থামিয়ে থামিয়ে বাস পরিচালনা ছিল একটি বিচক্ষণ কৌশল- যা অনেকেই ধরতে পারেন নি। আমি একজন বাস মুদিরকে (ম্যানাজারকে) ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করে এই 'ধীরে চল' ব্যবস্থার রহস্য উদ্ধার করতে সক্ষম হই।

রাতের অন্ধকারে বাইরে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছিলো না। তবে বড় হাইওয়ের দু'পাশের পাহাড়-পর্বত-টিলাগুলো চোখে পড়ছিলো। মরুভূমির দেশ তথাপি পাহাড়-পর্বতের অভাব নেই। মূলত সমগ্র দেশটিতে সর্বত্র ছোট-বড় পাহাড় বিদ্যমান। পাহাড়গুলোর বেশিরভাগ ছোট-বড় পাথর দ্বারা আবৃত। মনে হয়, এই পাথরগুলো নীরবে বসে আছে- কোটি কোটি বছর যাবৎ এভাবে কালক্ষেপণ করে যাচ্ছে।

মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌঁছার পূর্বে তিন-চার জায়গায় থামতে হয়। এসব জায়গায় আমাদেরকে জমজমের পানি, লাবান (দই) প্রভৃতি বিনামূল্যে বিতরণ করা হলো। আমরা লাব্বায়িক পড়তে পড়তে পবিত্র নগরীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম।

ভোর ৬টায় আমরা শহরের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলাম। শহরের ভেতর বাসটি ঢুকার পর হারাম শরীফ দৃষ্টিতে কখন পড়বে তা ভাবতে লাগলাম। সামনের দিকে তাকাচ্ছিলাম অধীর আগ্রহে। এরপর এক সময় আযান ধ্বনি ভেসে আসলো। দু'একজন বললেন, পবিত্র হারাম শরীফ তথা মসজিদুল হারামে ফযরের আযান পড়ে গেছে। এর ধ্বনি উঁচু-নিচু শত শত অট্টালিকা ও পাহাড়ের গাঁয়ে লেগে প্রতিধ্বনিত হয়ে এক অপূর্ব মধুর শব্দ-তরঙ্গ চতুর্দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। আমার হৃদয়টা এই আযানের ধ্বনিতে কেঁপে উঠলো। ভাবলাম, এই ধ্বনিটা ক্যাসেট ও সিডিতে কতো শুনেছি- আজ নিজের কানে হারাম শরীফের কাছে এসে শোনতে পেলাম। মনে মনে আবারও আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া জানালাম। এরপর হঠাৎ আমাদের মুদির তাঁর অত্যাধুনিক লাউড স্পিকারে এলান করলেন, 'আপনারা সামনেই পবিত্র হারাম শরীফ দেখতে পাচ্ছেন, ঐ দেখুন মসজিদুল হারাম!'

হারাম শরীফের উঁচু মিনার আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। ভাবলাম, আমি সত্যিই জগতের পবিত্রতম স্থানে এসে গেছি! আমরা ভেবেছিলাম ফযরের নামায মসজিদুল হারামেই পড়বো কিন্তু প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে হারাম শরীফ এলাকার সবগুলো রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের সময় এরকম করা হয়। আমার চোখে পড়লো অসংখ্য মানুষ হারাম শরীফের দিকে যাচ্ছেন। এক অপূর্ব দৃশ্য! এই বিরাট মানবগোষ্ঠি, এক আল্লাহ্র এই ভক্তরা শ্বেত-বস্ত্র পরে ধীর গতিতে চলছে বাইতুল্লাহর চতুর্দিকে অবস্থান নিয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করতে। সবার মধ্যে ভয় ও আশার মিলন ঘটেছে। হাঁটার ভঙ্গি যেনো স্বর্গপুরীর! পৃথিবীর মানবিক জঙ্গলে আবদ্ধ আমরা সবাই। জীবনকে নিয়ে কী ব্যস্ত! চলতে-ফিরতে তাই সর্বত্র ছুটোছুটি, দৌড়াদৌড়ি, হাহাকার, হতাশা। কিন্তু এখানকার ইবাদতকারীদের চলার ভঙ্গি, গতি, ভাব, উদ্দেশ্য, পরনের বস্ত্র, নারীদের পর্দা এবং মানুষের সংখ্যা ইত্যাদি সব মিলিয়ে পুরো পবিত্র নগরী যেন সত্যিই পৃথিবীর বুকে এক আদর্শ স্বর্গপুরী। কী অপূর্ব আমার দ্বীন-ইসলাম! যেদিকে তাকাচ্ছিলাম, শুধু মানুষ আর মানুষ। নদীর স্রোতের মতো সবাই চলছে। নদীর স্রোত যেরূপ মহাসমুদ্রের দিকে চলে, এই মানব-স্রোতস্বিনীও চলছে তাদের শেষ প্রত্যাবর্তন স্থল প্রভুর দিকে, প্রভুর ঘরের দিকে, স্বয়ং বিশ্বপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

আমাদের বাসটি চলতে লাগলো। কেন জানি ড্রাইভার কোথাও বাসটি পার্ক করতে চাইলেন না। তিনি আমাদেরকে নিয়ে প্রায় আধঘণ্টা সময় হারাম শরীফের

আশে-পাশে ঘুরতে লাগলেন। উঁচু-নীচু মডার্ন অট্টালিকার ফাঁকে ফাঁকে বারবার মসজিদুল হারাম দৃষ্টিতে পড়ছিলো। প্রতিবারই প্রাণখুলে দেখছিলাম। অবশেষে ভোর প্রায় ৭টার সময় আমাদের বাসটি নির্দিষ্ট স্থানে এসে থামলো। সামনেই অদূরে হারাম শরীফের উঁচু মিনার-দ্বয় সম্বলিত একটি প্রধান গেট, 'বাবুল ফাত্‌হ'। আমরা গাড়ি থেকে নেমে নির্দিষ্ট হোটেলে প্রবেশ করলাম। শামিয়া এলাকায় স্থাপিত আমাদের হোটেলের নাম হচ্ছে "দারুশ্‌ শামিয়া"। এর মালিক শেখ সাঈদ ও আবু সুফিয়ান। দু'জনই বাংলাদেশী। শেখ সাঈদ আমাদের মুদির সাহেবের মামাতো ভাই। আবু সুফিয়ান হচ্ছেন বিলেতের ব্রাডফোর্ড শহরে বসবাসরত মাওলানা আবু তাহের সাহেবের ছোট ভাই। অত্যন্ত বন্ধুসুলভ, অতিথি-পরায়ণ এই দু'ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম দেখায়ই কেমন যেনো মাহাব্বাত লেগে গেলো। তাঁরা যাত্রীদের সবাইকে সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। কিভাবে আমরা সবাই শান্তি পাবো, এটাই যেনো তাঁদের কাজ। পাঁচটি কক্ষে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। আমাদের কক্ষে মোট ১৫ জন পুরুষ। ফ্লোরের মধ্যে সিঙ্গল একেকটি স্পঞ্জের তৈরি বেড। ফ্লোরে বসে খাবারও খেতে হয়। এভাবে আমরা দীর্ঘ ১৮ দিন থাকলাম।

ফযরের নামায পড়েই দীর্ঘ ভ্রমণে ক্লান্ত, প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়লেন। সবাই একমত হলেন, যুহরের নামায পরে খাবার সেরে আমরা তাওয়াফে কুদুম ও সাঈ (সাফা-মারওয়া) সারবো। আমার ঘুম আসছিলো না। পবিত্র কাবা শরীফকে কবে প্রাণখুলে দেখবো, সে চিন্তায় ঘুম হারাম হয়ে গেছে। একা যাবার সাহসও হচ্ছিলো না। ভোরে এক সময় আমাদের মুদিরের সঙ্গে দেখা হলো। বললাম, জনাব! বাইতুল্লাহকে একনজর দেখার জন্য আমি ব্যকুল হয়ে উঠেছি। তিনি বললেন, ধৈর্য ধরুন- সবর! আমি আর কিছু বললাম না। ইতোমধ্যে জানতে পারলাম প্রখ্যাত আলীম, কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হোটেলেই আছেন। তিনি আগের দিন বাংলাদেশ থেকে এসেছেন।

কাতিয়ার শেখ সাহেবের সঙ্গে পরিচিতি অনেক আগের। মাত্র একব্যক্তি থাকার উপযোগী একটি ছোট্ট কক্ষে তিনি ছিলেন। দেখা করার জন্য চলে আসলাম। আমাকে দেখার পরই বৃটেনে তাঁর পরিচিত ইসলামী সমাচারের সম্পাদক আব্দুল মুকিত মুখতার, লেখক দেওয়ান শামসুল হুদা চৌধুরী, লেখিকা হুসনুল আম্বিয়া চৌধুরী ও তাঁর ছেলে সোহেল মিয়া প্রমুখ সবার খবরা-খবর জিজ্ঞেস করলেন [শেষোক্ত দু'জন আমাদের সাথেই হজ্জের সফরে এসেছিলেন]। এরপর পাঠকদের যে

বলেছিলাম, জিদ্দার হজ্জ টার্মিনাল আমরা কেন এত সহজে পাড়ি দিয়েছিলাম এর পেছনে রহস্য আছে, এবার তা প্রকাশ করছি। জানতে পারলাম কাতিয়ার সাহেব আমাদের জন্য এখানে (হারাম শরীফের ভেতরে) বসে বসে দু'আ করছিলেন। আল্লাহ্‌র বন্ধুজনদের দু'আ অবশ্যই আল্লাহ্‌র দরবারে মঞ্জুর হয়। বড় সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমরা এবার বয়োবৃদ্ধ অলিআল্লাহ হযরত শায়খে কাতিয়ার মতো মহাত্মনকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জ পালন করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। পুরো একমাসই তাঁর সঙ্গে সময় সময় দেখা করেছি। হজ্জের বিভিন্ন আহকাম সম্পর্কে এবং অন্যান্য ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি। সর্বোপরি, এক রাতে বাইতুল্লাহ্ শরীফের অতি নিকটে তাঁর কক্ষে তাহাজ্জুদের সময় হযরতের নিকট মুরীদ হই। আল্লাহ্ পাক তাঁর এই মায়ার বান্দাকে দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য দান করুন, আমীন। (আমার এই লেখার বেশ পরে ২০১০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর, ৩০ রামাদ্বান ১৪৩১ হিজরী, জুমু'আর দিন হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদেরকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন।)

যুহরের সময় নামাযে যাবো। আমাদের সবার কথা হলো, নামায পরে হোটেলে ফিরে খাবার সেরে তাওয়াফ করবো। তবে যুহরের ওয়াক্তে অন্তত বাইতুল্লাহ শরীফ দেখতে পাবো, এটা ভেবে অনেকটা স্বস্তিবোধ করছিলাম। আমরা ৬-৭ জনের একদল পুরুষ নামায পড়তে যাত্রা করলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন শায়খে কাতিয়া (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সাহেবের বড় সাহেবজাদা মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব। সবাই দু'তিন মিনিটের রাস্তা হেটে গেলাম।

বিরাট মসজিদুল হারাম চোখের সামনে। চতুর্দিক থেকে লাখ লাখ মানুষ ধীরে ধীরে মসজিদের দিকে যাচ্ছেন। প্রায় সবার পরনে ইহরাম। এই বিশাল জনগোষ্ঠির মধ্যে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা বিস্তর। তাই প্রাথমিক অবস্থায় সবাইকে একসঙ্গে থাকতেই হবে। মাওলানা ইমদাদুল্লাহকে আমাদের সঙ্গে দেওয়ার এটাই বড় কারণ। কোথাও জায়গা দেখাচ্ছিলো না। মসজিদ লোকে লোকারণ্য। হাজার হাজার মানুষ বাইরেও নামাযের জন্য অবস্থান নিয়েছেন। মাওলানা ইমদাদুল্লাহ সাহেব আমাদেরকে নিয়ে মসজিদের বেইসমেন্টে গেলেন। এখানেও লোকের অভাব নেই। মুসল্লি নারী ও পুরুষের সমাগম। তবে এখানে জায়গা আছে। আমরা যেখানে বসলাম সেখান থেকে বাইতুল্লাহ দেখাচ্ছিলো না। বাইতুল্লাহকে দেখার জন্য আমার হৃদয়ে হাহাকার শুরু

হয়ে গেল। আপাতত কিছু বললাম না। নামায শেষে হোটেলে যাবার জন্য মাওলানা ইমদাদুল্লাহ সবাইকে অবগত করলেন। আমি বললাম, হুজুর! বাইতুল্লাহ শরীফের এতো কাছে এসে গেছি। একনজর না দেখে কিছুতেই আমার মন যেতে চাচ্ছে না। আমার হৃদয়ে বাইতুল্লাহকে একবার দেখার তীব্র পিপাসা জেগে উঠেছে। তিনি বললেন, ঠিক আছে। আসুন, আমরা একবার কাবা শরীফ দেখে যাই।

প্রথম বাইতুল্লাহ্‌ দর্শন

সামনে এগিয়ে একটি সিঁড়ি বেয়ে আমরা মসজিদুল হারামের ভেতরে আসতেই পবিত্র কাবা শরীফ দৃষ্টিতে ভেসে এলো। থমকে দাঁড়ালাম। বাইতুল্লাহ শরীফকে এই জীবনের প্রথম দেখলাম। আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ! বলতে লাগলাম। কালো গিলাফে আবৃত আল্লাহ্‌র পবিত্র ঘর যেনো আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। গিলাফের নীচের অংশ তুলে দেওয়া হয়েছে, এরফলে বাদামি রংয়ের দেওয়ালের পাথরগুলো দেখাচ্ছিলো এবং গিলাফের নীচের রং সাদা হওয়ায় একটি মোটা শ্বেত রেখা ঘরটির চতুর্দিকে অঙ্কিত হয়েছে। পবিত্র ঘরের স্বর্ণের বিরাট দরজাটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দরজার নিকটতম কোণে স্থাপিত হাজারে আসওয়াদের সাদা রূপার ফ্রেমটি পরিষ্কার দেখাচ্ছিলো। বাইতুল্লাহর সামনেই পিতলের তৈরি মাকামে ইব্রাহীম দুপুরের রৌদ্রে ঝলমল করছে। অসংখ্য মানুষ তাওয়াফরত। মনে মনে পড়লাম, "আল্লাহু আকবার! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌"।

অনেকে বলেছেন, বাইতুল্লাহ্‌কে প্রথমবারের মতো দেখার সঙ্গে সঙ্গে যে দু'আ করা হয় তা কবুল হয়। ইমদাদুল্লাহ সাহেব হাত উঠালেন। আমরা পবিত্র ঘরের দিকে তাকিয়ে প্রাণখুলে দু'আ করলাম। মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, নিজের আমল-ঈমান ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দু'আ করলাম। দু'আ চলাকালে আমাদের সকলেরই চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। আল্লাহ্‌ পাক যে অনুগ্রহ করে তাঁর ঘরটি আমাদেরকে দেখালেন এ জন্য শুকরিয়া আদায় করলাম। আমি দু'আ শেষে চলে আসার সময়ও বার বার বাইতুল্লাহ্‌র দিকে তাকালাম। উজ্জ্বল শ্বেত-পাথরের তৈরী সমগ্র মসজিদুল হারাম এলাকার ঠিক মাঝখানে এই কালো ঘরটি যেনো অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে। এমন সুন্দর আর কিছু আমার জীবনে চোখে পড়ে নি। মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ্‌! দুনিয়ার এই পবিত্রতম ঘরটিকে কিবলা করে গণনাতীত মানুষ তোমার উপাসনা করে, আজ এখানে এনে তুমি এর সৌন্দর্য আমার দৃষ্টিপরে উন্মোচিত

করেছো। তোমার মহিমার শেষ নেই। হে প্রভু! এ অধম কিভাবে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবে সে ভাষা তার জানা নেই। শুধু এটুকু বলছি, হে প্রভু! তোমার দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া। আর তোমার হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর কোটি কোটি দরূদ ও সালাম, যিনি তোমার এই পবিত্র ঘর থেকে পৌত্তলিকতার কুফলে আড়ষ্ট ৩৬০টি মূর্তি উৎখাত করে গেছেন চিরদিনের জন্য। চির-পবিত্র করেছেন তোমার পবিত্র ঘরকে কাফিরদের অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করে, কঠোর ত্যাগ স্বীকার করে।

প্রথম তাওয়াফ ও সাঈ

আমরা বিকেল ৩-টার সময় সবাই একসাথে তাওয়াফে কুদুম ও সাফা-মারওয়ার সাঈ সম্পাদন করতে গেলাম। অনেকে অবশ্য উমরার তাওয়াফ-সাঈ করছিলেন। মসজিদুল হারাম পর্যন্ত রাস্তাটুকু আমরা উচ্চস্বরে লাব্বায়িক পড়তে পড়তে অতিক্রম করলাম। দু'টি সুউচ্চ অত্যন্ত সুন্দর মিনারসম্বলিত 'বাবুল ফাত্‌হ' নামক গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কাবা শরীফের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালাম। এরপর আবেগ-আপ্লুত, অশ্রুসজল চোখে সবাই প্রাণখুলে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র দরবারে দু'আ করলাম। তাওয়াফের জায়গায় (মুতাফে) পৌঁছে দেখলাম অনেকে তাওয়াফ করছেন। প্রচণ্ড গরম ও ভিড়ের মধ্যে লক্ষ্য করলাম, কাবা ঘরের নিকটতম এলাকায় ভিড়ের চাপ বেশি। আমরা অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থান নিয়ে হাজারে আসওয়াদ বরাবর বাদামি পাথরে অঙ্কিত রেখা থেকে তাওয়াফ শুরু করলাম। এই রেখাটি রুকনে হাজারে আসওয়াদ বরাবর তাওয়াফকারীদের সুবিধার্থে টেনে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রেখা বরাবর মসজিদের দেওয়ালে একটি সবুজ বাতিও আছে। (পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ এই রেখাটি তুলে দিয়েছেন।)

যে কোন তাওয়াফে সর্বমোট ৭টি চক্কর (শাওয়াত) দিতে হয়। তাওয়াফের সময় আমাদের মুদির ক্বারী মাওলানা উবায়দুল্লাহ আমিনী সাহেব সামনে হাঁটছিলেন আর প্রয়োজনীয় দু'আ পাঠ করছিলেন। আমরা তার সঙ্গে সঙ্গে দু'আ পড়ছিলাম। তবে যে দু'আটি আমরা বেশি পাঠ করেছি তাহলো, **"রাব্বানা আতীনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা আযাবান্নার, ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মা'আল আব্রার; ইয়া আজীজু, ইয়া গাফ্‌ফারু, ইয়া রাব্বাল আলামীন"**। অর্থাৎ: "হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদেরকে মঙ্গল প্রদান

করুন, পরকালে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচান এবং পুণ্যবানগণের সঙ্গী করে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহা-পরাক্রমশালী! হে ক্ষমাশীল! হে সর্ব-জাহানের পালনকর্তা!”

প্রচণ্ড গরম। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে উপর থেকে একটি বাতাস বয়ে সবাইকে শীতল করে দেয়। কী অপূর্ব! আল্লাহ্‌র অগণিত ভক্তরা তাঁর ঘরকে আদব ও মাহাব্বাতের সঙ্গে তাওয়াফ করছেন। সবাই কোন না কোন জিকির-আজকারে মত্ত। অনেকে নীরবে, অনেকে সরবে আল্লাহর প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করতে করতে চক্কর দিচ্ছেন। সমস্ত চত্বরটি এক অপূর্ব ধ্বনিতে মুখরিত; আল্লাহ-ভক্ত এই মানবগোষ্ঠির আবেগপূর্ণ প্রশংসা-ধ্বনি, চতুর্দিকের মসজিদুল হারামের ইমারতে লেগে প্রতিধ্বনিত হয়ে উপরের দিকে আরোহণ করছে; সোজা উপরে উর্ধ্বলোকে বাইতুল মামুরে যেয়ে ধাক্কা লেগে আরোও উর্ধ্বগামী হচ্ছে; এরপর পৌঁছে যাচ্ছে শেষ গন্তব্যস্থল, সবার প্রত্যাবর্তন-স্থল আরশে আজীম পর্যন্ত- স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের দরবারে। এক আল্লাহ্‌র উপাসনার অপূর্ব আওয়াজ! আমি নীচের দিকে তাকিয়ে থেকে তাওয়াফ করছিলাম। আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের আকর্ষণ এই তাওয়াফের সময় অনুভূত হয়। এই আকর্ষণের স্বরূপ বর্ণনা করতে আমি অপারগ। আমার অনুরোধ, পাঠকদের যারা এখনও হজ্জব্রত পালনে যান নি, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব যাওয়ার নিয়ত করুন। আল্লাহ্‌র ঘরকে তাওয়াফ করার মতো বড় কোন ইবাদত আছে বলে আমি মনে করি না। তাওয়াফের মাধ্যমে ঈমানী শক্তি দৃঢ়তর হয়, ইলমে মা'রিফাত হাসিল হয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, দু'আ কবুল হয়, আমল-আখলাক সংশোধিত হয়।

খানায়ে কাবার উপরে রাহমাত নাযিল হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ইমাম গায্‌যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “খানায়ে কাবার উপরে প্রত্যহ ১২০টি রাহমাত নাযিল হয়। এর মধ্যে ৬০টি তাওয়াফকারীর জন্য, নামায আদায়কারীর জন্য ৪০টি, দর্শকের (যারা কাবা শরীফের দিকে শুধুমাত্র তাকিয়ে থাকে তাদের) জন্য ২০টি রাহমাত আসে।” সুতরাং বুঝা গেল তাওয়াফের মধ্যেই ফজিলত সর্বাপেক্ষা বেশি।

তাওয়াফের সময় নারী-পুরুষ একই সঙ্গে তাওয়াফ করেন। কিন্তু কোন সমস্যা নেই, কেউ কারোর প্রতি একটুকুও বিরক্তিবোধ দেখান না। ভিড়ের কারণে সময় সময় ধাক্কা লেগে যায়, কিন্তু সবাই ধৈর্যশীল। বাইতুল্লাহর সামনে বে-আদবি হওয়ার

ভয়ে সবাই আতঙ্কিত। অনেকের চোখে অশ্রু। কেউ কেউ বেশ আপ্লুত হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন।

৭টি চক্কর পূর্ণ করে মাক্বামে ইব্রাহীমের পেছনে দু’ রাকআ’ত ওয়াজিবে তাওয়াফ নামায পড়তে হয়। অবশ্য মসজিদের যে কোন স্থানেও এ নামায পড়া যায়। আমরা এ নামায শেষ করে জমজম কূপের দিকে অগ্রসর হলাম। প্রচণ্ড ভিড়। নারী ও পুরুষদের প্রবেশ পথ আলাদা। আমরা ৮-৯টা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে কূপটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। লক্ষ্য করলাম কূপ থেকে পাম্প করে পানি উত্তোলন করা হচ্ছে। পাশের ট্যাপগুলো থেকে পানি পান করতে হয়। নিয়ম হলো কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে এ পানি পান করা। পান করার সময় যে দু’আটি পড়া উত্তম তাহলো, **“আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকা ’ইলমান নাফিয়ান, ওয়া রিযকান ওয়াসিয়ান ওয়া শিফা-আম্মিন কুল্লি দা-য়ীন”**। অর্থাৎ: “হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ফলপ্রসূ জ্ঞান, সচ্ছল জীবিকা এবং সকল রোগের নিরাময় কামনা করছি”। ভাল করে পেটপুরে পবিত্র পানি পান করলাম। এরপর আমরা সাঈ করার উদ্দেশ্যে চললাম। (**দ্রঃ** এখন জমজম কূপ দেখার আর সুযোগ নেই। কর্তৃপক্ষ কূপের উপরে মার্বেল পাথরের ছাদ দিয়েছেন। সকলে কূপের উপর দিয়ে তাওয়াফ করেন।)

বর্তমানে সাফা ও মারওয়া পাহাড় মসজিদুল হারামের ভেতরই অবস্থিত। দু’টি পাহাড়ের নিদর্শনস্বরূপ মূল পাহাড়ের কিছু অংশ এখনও বিদ্যমান। সাঈতেও ৭ চক্কর দিতে হয়। আসলে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাওয়াই হচ্ছে এক চক্কর। সুতরাং আমরা সাফা থেকে শুরু করে মারওয়ায় এসে ৭ চক্কর বা দৌড় পূর্ণ করলাম। সাঈর মাঝ-পথে (বাস্তবে কিছুটা সাফার নিকটে) দু’টি সবুজ বাতি দ্বারা চিহ্নিত কিছু অংশ আছে। একে **‘বাতনে ওয়াদী’** বলে। এই জায়গা পুরুষরা অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে অতিক্রম করেন। এই দৌড় কিসের স্মৃতি বহন করে, তা সবার জানা। বিবি হাজেরা আলাইহাস-সালাম স্বীয় পুত্র শিশু ইসমাঈল আলাইহিস-সালামের জন্য পানির খোঁজে এই দুই পাহাড়ে বেহুঁশ হয়ে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। সাঈর মাধ্যমে সেই দৌড়েরই পুনরাবৃত্তি করেন হাজীরা। সাঈর সময় বিভিন্ন দু’আ পড়া যায়। তবে দুই পাহাড়ে আরোহণের সময় যে দু’আটি পড়া উত্তম তা হলো কুরআন শরীফের একটি আয়াত:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ

উচ্চারণ: “ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআ’ইরিল্লাহ্‌ ফামান হাজ্জাল বাইতা আওয়ি’তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আই-ইয়্যাত্তাওয়াফা বিহিমা ওমান তাতাওয়্যা’আ খাইরান ফাইন্নাল্লাহা শাকিরুন আ’লীম।”

অর্থাৎ: “নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি বাইতুল্লায় হজ্জ কিংবা উমরাহ করবে তার জন্য কোন গোনাহ নাই, কেউ স্বেচ্ছায় ভালো কাজ করলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পুরস্কার-দাতা, সর্বজ্ঞ”। (সূরা বাক্বারা (২) : ১৫৮)

সাঈ শেষে আমাদের মধ্যে যারা তামাত্তু হজ্জ পালনকারী ছিলেন, তারা মাথামুণ্ডন করে হালাল (ইহরাম থেকে মুক্ত) হয়ে গেলেন। আমি এবং আরও ৫-৬ জন ইহরাম অবস্থায়ই হজ্জের শেষ পর্যন্ত থাকলাম। আমরা ছিলাম ক্বিরান হজ্জ পালনকারী।

জীবনের প্রথম এই তাওয়াফ ও সাঈ করে যে অনুভূতি হৃদয়ে প্রোথিত হয়েছে তা কখনও ভুলার নয়। আল্লাহ্‌র ঘরের চতুর্দিকে চক্কর দিতে পেরে এবং তাঁর পবিত্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ পেয়ে সত্যিই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলাম। আমি দু’আ করি এ ভাগ্য সবার জীবনে দেখা দিক। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তা আসুক।

পবিত্র হজ্জ ১৪২১ হিজরী: ব্যক্তিগত অনুভূতি

৮ই জিলহজ্জ। এদিনই হলো **'ইয়াওমুত তারবিয়াহ'** তথা মিনায় যাত্রার দিন। আমরা সবাই প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদী সঙ্গে নিয়ে সকাল ১১টায় বাসে উঠলাম মক্কা শরীফের উপকণ্ঠে অবস্থিত মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে। উচ্চস্বরে সবাই লাব্বায়িক বা তালবিয়া পাঠ করতে করতে যাচ্ছিলাম। স্বভাবতই রাস্তায় প্রচণ্ড যানজট। এদিন সব হজ্জযাত্রী মিনায় যাওয়ার কথা। যুহরের নামাযের সময় আমরা মিনায় এসে পৌঁছলাম। আমাদেরকে একটি বৃহৎ ফাইবার গ্লাসের তৈরি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবুতে জায়গা দেওয়া হলো। মহিলাদের জন্য পর্দা করা আলাদা আরেকটি তাঁবু পাশেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আমাদের সাথে ১৫-১৬ জন মহিলা ছিলেন। তারা সবাই ঐ তাঁবুতে প্রবেশ করলেন।

মিনা এখন তাঁবুর শহর। আগুন থেকে রক্ষার জন্য ফাইবার গ্লাস দ্বারা নির্মিত এসব তাঁবু স্থায়ীভাবে এখানে তৈরি করা হয়েছে। আড়াই থেকে তিন মিলিয়ন হাজীদের থাকার জন্য মিনায় এখন বেশ কয়েক হাজার এরূপ তাঁবু আছে। প্রতিটি তাঁবুতে ৪০ থেকে ৬০ জন পর্যন্ত হাজী অবস্থান করতে পারেন। তাঁবুর ভেতর কার্পেট বিছানো। তবে নীচে বালু থাকায় এগুলো অনায়াসেই বালুকাময় হয়ে যায়। আমরা কিছুক্ষণ আরাম করলাম। অনেকে ঘুমিয়ে পড়লেন। যুহর ও আছরের মুসাফিরী নামায (কছর) জামাআতের সঙ্গে পড়লাম। এরপর বিকেলে বাইরে গিয়ে মিনার পারিপার্শ্বিকতা অবলোকন করলাম।

মিনার দু'দিকেই বড় বড় পাহাড়। মিনা থেকে যেদিকে মুজদালিফা ও আরাফাতের ময়দান অবস্থিত সেদিকে একটু অগ্রসর হলাম। বেশ দূরে যেতে সাহস করছিলাম না। সবগুলো তাঁবু একই ধরনের। অতি সহজেই কাফেলা থেকে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাঁয়ে যে পাহাড়টি ছিলো, এর একেবারে নিকটে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, সমস্ত পাহাড়টি শক্ত পাথরের তৈরি। উপরে অনেকগুলো ছোট-বড় পাথর চোখে পড়লো। মনে হলো এগুলো পড়ে যাবে! কিন্তু না, হাজার হাজার বছর যাবৎ এগুলো বসে আছে। এই পাথরগুলো শত শত বছর যাবৎ মিনায় অবস্থানরত হাজীদের দেখছে। একটি বড় পাথর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

দেখতে মনে হয় এটা মানবতৈরী। কিন্তু আসলে তো তা ছিলো না। আমার সঙ্গে তখন ইংল্যাণ্ডের ইপসূইচ শহরের হজ্জযাত্রী জনাব তবারক আলী ও তাঁর পুত্র আসকর আলী। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, "এই পাথরটি দেখতে কী মনে হয়?" আসকর আলী বললেন, "মনে হয় কেউ যেনো বসে আছে।" তবারক আলী বললেন, "না, আমার কাছে লাগে একটি বৃহৎ চেয়ার"। তবারক আলী সাহেবের কথাটিই আমার কাছে ঐ পাথরের গঠনের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে বলে মনে হলো। যা হোক, আমাদের তাঁবুর কাছে এই পাথরটি থাকায় সবার জন্য বেশ ভালোই হলো। এটা তাঁবু খুঁজে বের করার জন্য একটি ল্যান্ডমার্ক হিসেবে কাজ করলো। কেউ কেউ এটাকে নামকরণ করলেন, "মিনার পাহাড়ের চেয়ার"।

রাতের বেলা লক্ষ্য করলাম, মানুষ শুধু তাঁবুতেই থাকেন না। মিনার বিভিন্ন প্রশস্ত রাস্তায়ও অসংখ্য মানুষ অবস্থান করছেন। রাস্তায় খাবার ও চায়ের অভাব নেই। তবে চা যারা পরিবেশন করলো তাদের প্রায় সবাই বাঙ্গালী বংশোদ্ভুত। এছাড়া রাস্তায় যারা ঝাড়ু দেয় তারাও বাঙ্গালী। অল্প বয়সের একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, সমস্ত হজ্জ মৌসুমের জন্যে তাকে চুক্তি-ভিত্তিক কাজে আনা হয়েছে। ১৫০০ রিয়াল তার বেতন। আমার কাছে এই শ্রম-মূল্য বেশ অল্প বলে মনে হলো। যা হোক, আমরা বেশ শান্তিতেই মিনায় রাত কাটালাম। পরদিন ভোরে আমাদেরকে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে হবে। এদিনই হচ্ছে **'ইয়াওমুল আরাফাহ'** তথা আরাফাতের দিন।

উকুফে আরাফাত

উকুফে আরাফাত বা আরাফাতে অবস্থান হচ্ছে হজ্জের অন্যতম ফরয। হাজীরা ৯ই জিলহাজ্জ ফযরের নামায আদায় করে আরাফাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে বাসের জন্য লাইনে দাঁড়ানোর চেয়ে তাঁবুতেই অপেক্ষা করা ভালো। আমাদের মুদির আমাদেরকে এ পরামর্শই দিলেন। তবে কাফেলার কেউ কেউ অস্বস্তিবোধ করছিলেন। শেষে ভোর ১০টার সময় আমরা বাইরে চলে আসলাম। আল্লাহ্র অনুগ্রহে এবং মুদিরের চেষ্টায় আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি বাস পেয়ে গেলাম। তবে পাশেই গেটের সামনে লোকের ঠেলা-ধাক্কা দেখে বুঝতে পারলাম অবস্থা কিরূপ দাঁড়াতে পারে! চোখে পড়লো একজন মহিলা ধাক্কার চোটে দূরে ছিটকে পড়লেন! যা হোক,

আমাদের গাড়ি ধীরে ধীরে আরাফাতের ময়দানের দিকে চলতে লাগলো। আমরা সবাই উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে লাগলাম।

আমাদের বাসটি মুজদালিফার মাঠ অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছিল। এখানে ২৬ নং গেটটি কোথায় তা কাফেলার প্রধান সবাইকে দেখিয়ে বললেন, আজ রাত এসে আমরা এখানেই অবস্থান করবো। মুজদালিফা ও আরাফাতের মাঝখানে **'ওয়াদি মুহাস্সার'** নামক স্থানে গজবের পাহাড় অবস্থিত। এ পাহাড়েই হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের বছর আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ আবরাহার হস্তি-বাহিনীকে আল্লাহ্ পাক আবাবিল পাখি দ্বারা ধ্বংস করেছিলেন। এখানে এসে গাড়িটা দ্রুত চলতে লাগলো। আমি ভীত-সংকোচে দু'ধারের কালো পাহাড়গুলো দেখলাম। মনে মনে আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা-প্রার্থনা করছিলাম। ভাবলাম, আল্লাহ্র গজব যখন পতিত হয় তখন খুব কঠোরভাবেই হয়। আজকের পৃথিবীতেও এই গজবের নিদর্শন আমরা দেখছি। বন্যা, মহামারী, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, সুনামী- এসব কী? এগুলো তো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে গজব ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু গাফিল মানুষ আমরা! গজবের ভয়ঙ্কর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেও নিজেকে সংশোধন করতে অগ্রসর হই না। কী আশ্চর্য মনভুলা আজকের এই মানবগোষ্ঠি! ভুয়া বাদ-মতবাদে পথভ্রান্ত, যুক্তি-পাগল বিশ্বসমাজ আজ আল্লাহ্ থেকে দূরে সরে পড়ছে। এর পরিণাম কি দাঁড়াতে পারে? আল্লাহ্র রোষ যখন পৃথিবীতে পড়বে তখন সমস্ত ধরার কোল গর্জে উঠবে। তখন কী উপায় হবে? মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে- মুসলমানদেরকে তুমি রক্ষা করো। এদের মধ্যে ইসলামী চেতনা পূর্ণভাবে জাগ্রত করে দাও। সবাইকে এক করো। সবাইকে ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান করো। তোমার রোষের পাত্রে আমাদেরকে পরিণত করো না।

আমরা আরাফাতের বিশাল প্রান্তরে এসে পৌঁছলাম। তখন দুপুর বারোটা। ইতোমধ্যে অসংখ্য মানুষ এসে গেছেন। যেদিকে তাকাচ্ছিলাম সেদিকেই দেখা যাচ্ছিল সাদা ইহরাম অবস্থায় শুধু মানুষ আর মানুষ। এক পর্যায়ে আমার চোখে পড়লো জাবালে রাহমাতের টিলাটি। এর চতুর্দিকে অসংখ্য মানুষ। শ্বেত বস্ত্রে দেহাবৃত পাগল-প্রায় এই মস্তক উন্মুক্ত বনী

আদমের দলটি- যেন টিলার চতুর্দিকে লটকে আছেন। এ দৃশ্য দূর থেকে কেমন যেনো অদ্ভুত লাগে, যেনো অপর জগতের!

আমরা আরাফাতের ময়দানে ২৬ নং এলাকায় এসে তিনটি তাঁবুতে অবস্থান নিলাম। বড় একটি তাঁবুতে সকল মহিলা ছিলেন। পুরুষরা বাকী দু'টোয়। দিন-দুপুর। বেশ গরম। অনেকে ক্লান্তিবোধ করছিলেন। যুহরের নামাযের সময় হলো। আমরা জামাআতে নামায আদায় করলাম। এরপর দীর্ঘ একটি মুনাজাত হলো। এসময় আমি তাঁবুর বাইরের দিকে ছিলাম। মুনাজাতের এক পর্যায়ে আমার উপর কয়েক ফোটা বৃষ্টির পানি পতিত হলো। এরপর কিছুটা বেশি বৃষ্টি হলো। কিন্তু কয়েক মিনিট পরই আবার থেমে গেলো।

আরাফাতের ময়দানে ৯ জিলহাজ্জ বৃষ্টি! এটা তো আল্লাহ্‌র খাস্ রাহমাত। কিন্তু এ সামান্য বৃষ্টি কিছুই ছিলো না। বিকেলে এমন বৃষ্টি হলো, যা বাংলাদেশের বর্ষার আষাঢ়ি বৃষ্টিকেও হার মানাবে। বৃষ্টির সঙ্গে প্রবল ঝড়ো বাতাসও বয়ে গেল। যুহরের নামায শেষে কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার ঘুম আসছিলো না। তাঁবুর বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে দেখলাম। এক আল্লাহ্‌র ভক্তরা একত্রিত হয়েছেন তাঁর দরবারে মাফি চাইতে। আরাফাতের ময়দান থেকেই হাজীরা নিষ্পাপ অবস্থায় বেরিয়ে আসেন। এখানে অনবরত আল্লাহ্‌র রাহমাত নাজিল হচ্ছে। এই আরাফাত কিয়ামতের মাঠের নমুনাও বটে।

আরাফাতের ময়দানে অবস্থান থেকে শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে ইমাম গায্‌যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মানুষের ভিড়, উচ্চ কোলাহল, ভাষার বিভিন্নতা, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ইমাম তথা আমীরের সঙ্গে সঙ্গে চলা দেখে শিক্ষা নিতে হবে। স্মরণ করা চাই, হাশরের মাঠেও সব উম্মত যার যার নবীসহ এমনিভাবে একত্রিত হবেন। মানুষ সেদিন শাফাআতের আশায় অস্থির হয়ে উঠবে। আরাফাতের ময়দান সত্যিই এক অপূর্ব মিলনকেন্দ্র। এখানে সব জাতি একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অন্বেষণ করেন। সমগ্র বিশাল প্রান্তরব্যাপী দলে দলে মানুষ অবস্থান নিয়ে হাশরের মাঠের অবস্থার সাদৃশ্য সৃষ্টি করেন। আত্মিক দিক থেকে আরাফাতের অবস্থা অনুধাবন করা একান্ত জরুরী। ইমাম গায্‌যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও বলেছেন, আরাফাতে অবস্থান করে এরূপ ধারণা করা গোণাহ যে, আল্লাহ্ আমার মাগফিরাত করেন

নি। আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ্‌র ওলি-আবদাল, সৎকর্মশীলরা অবশ্যই থাকেন। এরা সকলেই হাজীদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মাগফিরাত কামনা করেন। সুতরাং এ জায়গাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাহমাত আকর্ষণ করার সর্বোত্তম স্থান। এখানে হাজীরা সারাদিন ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকেন।

ব্যক্তিগতভাবে আরাফাতের যে সময়টি আমার কাছে সর্বাপেক্ষা উত্তম বলে মনে হয়েছে তাহলো, বিকেলে উর্ধ্ব দিকে হাত উত্তোলন করে দু'আটি। এ সময় সবার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্‌র প্রতি আকর্ষণ ও ইশ্‌কের এক অপূর্ব অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে। অনেক কঠিন হৃদয়ও এসময় মোমের মতো গলে যায়। অনেকে আল্লাহ্‌র রাহমাতের বহু নিদর্শনও দেখতে পান। আমরা মুনাজাত শেষ করার পরই ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। অনেকে বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেলাম। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়লো। শীতে ইহরাম অবস্থায় অনেকেই কাঁপতে লাগলেন। ঘণ্টা খানেক বৃষ্টি হলো। এরপর রাত দশটা পর্যন্ত আমরা সেখানে ছিলাম। তখন পর্যন্ত ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাচ্ছিলো।

আরাফাতের ময়দানে অতীতে এরূপ ভীষণ বৃষ্টি হয়েছে, একথা কারো স্মরণে নেই। হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, আমি অনেকবার হজ্জপালন করেছি। এবারের হজ্জের মতো কোন হজ্জই পালন করি নি। এবার আরাফাত, মুজদালিফা, মক্কা, মদীনা এমনকি জিদ্দায়ও বৃষ্টি আর বৃষ্টি। এটা অবশ্যই আল্লাহ্‌র খাস্‌ রাহমাত। আরও অনেকে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। বাস্তবে হজ্জের মৌসুমে সাধারণত এরূপ বৃষ্টি হয় না। অনেকের ভাবনা, এবার হজ্জে আল্লাহ্‌র কোন বিশেষ বন্ধুজন উপস্থিত ছিলেন- হয়তো তাঁর ওয়াসিলায়ই এভাবে রাহমাতের বারিধারা পতিত হয়েছে। আরাফাতের ময়দানে আরও একটি বিষয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এক যুবকের কণ্ঠে মহানন্দের চিৎকার

সন্ধ্যের পূর্বে হঠাৎ এক যুবককে দেখলাম, আমাদের দিকে ছুটে আসছেন। তিনি চিৎকার দিয়ে বার বার বলছেন, আল-হামদুলিল্লাহ! সবার হজ্জ কবুল হয়েছে! সবার হজ্জ কবুল হয়েছে! আমি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি। তিনি আরাফাতে এসেছিলেন। আমি

লোকটির কথা শোনে এগিয়ে আসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কিভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখলেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি এখানে এসে ঘুমিয়ে পড়ি। তখন স্বপ্নে দেখলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে একদল লোককে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। আমি লোকটির কথায় আপ্লুত হলাম। তিনি যে, বানিয়ে কথা বলছেন না তা সহজেই অনুমেয়। তাঁর চেহারা মহানন্দে উজ্জ্বল নূরান্বিত হয়ে উঠেছে। ভাবলাম, আহা! এ লোকটি কতো ভাগ্যবান! আরাফাতের মাঠে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে তাঁর জিয়ারত নসীব হয়ে গেলো। মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ্! আমি তো এই জিয়ারতের আশায় জীবন কাটিয়ে দিলাম। তুমি অনুগ্রহ করে তোমার হাবীবের সঙ্গে জিয়ারত নসীব করো গো প্রভু। প্রিয় পাঠক! পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখার মতো সৌভাগ্য ক'জনের থাকে? ভেবে দেখুন ঐ যুবকটির ভাগ্য কতো বড়। তিনি তাঁকে দেখে খুশী হয়ে আরাফাতের মাঠে হাজীদেরকে তার সৌভাগ্যের কথা চিৎকার করে জানিয়ে দিয়েছেন। হাজীদের অনেকে এ সুসংবাদ শ্রবণ করে কাঁদতে লাগলেন। বলাই বাহুল্য, আমারও চোখদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়েছে।

মুজদালিফায় রাত্রি যাপন

রাত সাড়ে দশটায় আমরা বাসযোগে মুজদালিফার মাঠে এসে উপস্থিত হলাম। আমরা আসার পূর্ব পর্যন্ত এখানেও ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে। মুজদালিফার মাঠ ও এর মধ্যে অবস্থানরত অগণিত হাজীদের দৃশ্য আরও অপূর্ব! তবে প্রথমেই আমি কিভাবে হারিয়ে গেলাম, সেটা বলে দিচ্ছি।

আমাদের কাফেলার আমীর ক্বারী উবায়দুল্লাহ আমিনী সাহেব আগেই বলেছিলেন, মুজদালিফার মাঠে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা বেশি। এখানে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাঁর এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও সর্বপ্রথম আমি নিজেই বাস থেকে নামার পর হারিয়ে গেলাম! মুজদালিফার অদ্ভুত ব্যাপারটি হলো রাতের বাতিতে কাউকে চিনতে পারা যায় না। সব পুরুষ ও সব মহিলাকে দেখতে একই ধরনের মনে হয়। সবার পরনে সাদা ইহরাম, মাথা উন্মুক্ত। একেবারে কাছের লোকটিকে মনে হবে তিনি আপনার সাথী। কিন্তু যখন কথা বলবেন, তখন বুঝতে পারবেন এ লোকটির ভাষাই

আপনার জানা নেই! এ হলো অবস্থা! আমরা বাস থেকে নামার পর স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমাদের কাফেলার প্রধান তাঁর হাতের লাউড স্পিকার নিয়ে ডানে হেটে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে কাফেলার নারী-পুরুষ। আমি ও ইপসূইচের ভাই তবারক আলী সাহেব সেদিকে অগ্রসর হলাম। অবশ্য তবারক আলীকে আমিই সেদিকে যেতে বলি। সুতরাং তিনিও হারিয়েছিলেন একথা বলা সঠিক হবে না। বাস্তবে আমি তাঁকেও হারিয়েছিলাম!

যা হোক, কিছুদূর যেতে না যেতেই আরেক কাণ্ড ঘটলো। সাথী তবারক আলীকেও আমি হারিয়ে ফেললাম। দেখলাম আমি একা! এরপর সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি আমাদের কাফেলার কেউ নেই! আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। কিছুটা বিচলিত হয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে লাগলাম। মিনিট দু'এক পরে লক্ষ্য করলাম, বেশ উত্তেজিত হয়ে তবারক আলী আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। অন্তত তাঁকে ফিরে পেয়ে কিছুটা সান্ত্বনা বোধ করলাম। তিনি বললেন, "তুমি বললে, ওরা ওদিকে গেছেন? ওদিকে তো কেউ নেই!" আমি আস্তে আস্তে বললাম, আমায় মাফ করুন- দয়া করে উত্তেজিত হবেন না। বাস থেকে নামার সময় বায়ের দিকে যে গেটটি দেখেছিলাম, তা কোথায় অবস্থিত আমার মনে আছে। আসুন, ইনশাআল্লাহ্‌ আমাদের কাফেলাকে খুঁজে পাবো।

সবগুলো গেটও একই ধরনের। বিরাট লম্বা লম্বা পিলারের মাধ্যমে ফ্লাড-লাইটে সমগ্র মাঠটি আলোকিত। এগুলোও দেখতে একই ধরনের। ব্যতিক্রম শুধু এটুকু, প্রতিটি পিলারের মধ্যে আলাদা একেকটি নাম্বার এঁটে দেওয়া হয়েছে। আমরা মাঠের ভেতরে ঢুকে কাফেলাকে খুঁজতে লাগলাম। এরপর আমার কানে ভেসে এলো আমাদের আমীরের লাউড স্পিকারের শব্দ। আমি তবারক আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, বলুন তো, এই শব্দটি কোন্‌ দিক থেকে আসছে? তিনি হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, ঐ দিক থেকে। আমরা সেদিকে অগ্রসর হয়েই দেখি ক্বারী উবায়দুল্লাহ আমিনী সাহেব আমাদের নাম ধরে ডাকছেন। কাফেলায় ফিরে যেয়ে জানতে পারলাম, শুধু আমরাই হারাই নি। আরও ৫-৬ জন বাস থেকে নেমেই হারিয়ে যান। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই একত্রিত হলাম।

মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে পড়লাম। এরপর অনেকেই ঘুমানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমার ঘুম আসলো না। আমি মুজদালিফার বিশাল

খোলা প্রান্তরে দলে দলে অবস্থানরত হাজীদের দেখে ভাবলাম, এতো কিয়ামতের দৃশ্য! সবাই কাফন পরে কবর থেকে উত্থিত হয়েছেন। একে অন্যকে চিনতে পারছেন না কেউ। সবাই একই ধরনের, সবার মনে আল্লাহ্র অনুগ্রহের কামনা। লক্ষ্য করলাম অনেকেই সাথীদের হারিয়ে খোঁজাখুঁজি করছেন। কিন্তু কেউ যেনো পেরেশান নন। ধীরে ধীরে হাটছেন। সবার মাঝে এক অদ্ভুত শান্ত ভাব। আমরা অপেক্ষাকৃত উঁচু একটি জায়গায় ছিলাম, তাই সমগ্র মাঠটি পরিষ্কার দেখাচ্ছিলো। রাত ১টা পর্যন্ত লোকজন আরাফাত থেকে মুজদালিফায় আসতে দেখলাম। মুজদালিফার এই মাঠের অপর এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে নারী পুরুষ একত্রে খোলা মাঠে রাত কাটান। অথচ ১৪০০ বছরের মধ্যে এখানে কোন ধরনের অঘটন ঘটে নি। এছাড়া এ মাঠে খুব গভীর ঘুমও হয়। যদিও আমি নিজে তেমন বেশি ঘুমোতে পারি নি। এক পর্যায়ে বালুকার উপর চিত হয়ে পড়ে অসংখ্য তারকায় উজ্জ্বল-সুশোভিত সুউচ্চ আকাশপানে তাকালাম। মনের ভেতর প্রশ্ন জাগলো, দু' টুকরো অল্পমূল্যের সাদা কাফন-সদৃশ ইহরাম পরনে ধূলো-বালুতে পড়ে থাকা এই মানুষটি কে? উত্তর খুঁজে পেলাম না। তবে এ অনুভূতি এসে নিজেকে আড়ষ্ট করলো, "আমি কেউ নয়, ধূলো-বালির মতো মাটির কায়া মাত্র! আল্লাহর বড়ত্ব, মাহাত্ম্য, অসীমত্বের সামনে এই মাটির দেহবিশিষ্ট মানুষটি তো অণুকণা থেকেও ক্ষুদ্র বরং আরো ক্ষুদ্র, আরো ক্ষুদ্র, অস্তিত্বহীন, বিলীন ..."।

আমাদের কাফেলার একজন সদস্যের নাম গয়াস মিয়া। তিনি বৃদ্ধা মা-কে নিয়ে হজ্জপালন করছিলেন। গয়াস মিয়া মুজদালিফায় পৌঁছে নামায শেষে অনেকের মতো ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু তার আম্মাজান কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে একখানা চাদর গায়ে দিয়ে বসে আছেন। আমি তার পাশের 'হুইল চেয়ারে' গিয়ে বসে পড়লাম। বেশ দুর্বল, বৃদ্ধাকে সজাগ দেখে প্রশ্ন করলাম, কেমন আছো মা? আপনার শরীর ভালো নয় বুঝি? তিনি ভাঙ্গা গলায় জবাব দিলেন, 'অয়রে বাবা! আমার শরীল ভালা নায়! আমি আমার মেয়ে ও বউরে কইয়া আইছি আল্লায় আমারে যেনো ওখানো মউত দেলাইন!'

বৃদ্ধার কথায় অন্তর ধুরু ধুরু করে উঠলো। ভাবলাম, এক যামানা ছিলো যখন হজ্জযাত্রীরা নিজের আহলে-আওলাদ ও পাড়া-পড়শীদের কাছ থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে অত্যন্ত আনন্দচিত্তে বলতেন, আপনারা দু'আ করবেন,

আল্লাহ তা'আলা যেনো আর ফিরিয়ে না আনেন! আজকাল অবশ্য এরূপ বলনেওয়ালার সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। এই মহিলার মনের আকুতি ব্যর্থ যায় নি। হজ্জ পালন শেষে মিনা থেকে মক্কা শরীফ ফেরার চারদিন পর আসরের নামাযের সময় তিনি নিজের হোটেল কক্ষে ঘুমান্তাবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। মসজিদুল হারামে বাইতুল্লাহ্‌র মেহমানের বৃহৎ এক কাফিলা তাঁর জানাযার নামাযে শরীক হয়েছেন। তিনি শায়িত আছেন পৃথিবীর যমিনে আল্লাহ-ঘোষিত সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও মর্যাদাশীল শহর মক্কা মুয়াজ্জমার মাটিতে। আল্লাহ পাক এই সৌভাগ্যশীল হাজীয়াকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সম্মানিত স্থানে অধিষ্ঠিত করুন।

মুজদালিফার দু'দিকে পাহাড়। লক্ষ্য করলাম, অনেকে পাহাড়ে আরোহণ করছেন। এরা যে হজ্জযাত্রী তা সহজেই অনুমেয়। কারণ সবার পরনে ইহরাম। তবে এরা কেন পাহাড়ে আরোহণ করছেন সে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় নি। মুজদালিফার মাঠ থেকে এক পর্যায়ে আমরা জামারাতে শয়তানকে কঙ্কর মারার জন্য পাথর সংগ্রহ করলাম। পাথরের জন্য দূরে যেতে হলো না। বালুকার ভেতর হাত ঢুকালেই ছোট-বড় অসংখ্য পাথর বেরিয়ে আসে।

মিনায় প্রত্যাবর্তন ও জামারাতে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ

মুজদালিফার রাতের দৃশ্যটি আজো আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়ে আছে। হয়তো কোনদিন তা মুছে যাবে না। মানুষ যে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সব সমান, ঐ দৃশ্য আমাকে বার বার বলে দেয়।

'উকুফে মুজদালিফা'র ওয়াজিব সময় হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। আমরা ফযরের নামায আদায় করে মিনায় প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভোর ৭ ঘটিকার সময় দেখলাম মাঠে অনেকেই আর নেই। প্রায় সবাই চলে গেছেন। তারপর একটা গাড়ি আসলো। আমরা এতে আরোহণ করলাম। আধ ঘণ্টার ভেতরই আমরা মিনায় পৌঁছলাম। তবে সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম আমাদের আগের তাঁবুটি অন্য আরেক কাফেলার দখলে! তাঁবুর মুদির (ম্যানেজার) অনেক চেষ্টা করেও আমাদেরকে সেই তাঁবুতে অবস্থান দিতে সমর্থ হলেন না। যা হোক, অনতিদূরে অপর দু'টি অপেক্ষাকৃত ছোট্ট তাঁবুতে আমরা প্রবেশ করলাম। (**দ্রঃ** সাধারণত এভাবে তাঁবু দখল হয় না, আমাদের ক্ষেত্রে

ব্যাপারটি ছিলো কিছুটা ব্যতিক্রম।) আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, যুহরের নামাযের পর জামারাতে বড় শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে যাত্রা করবো। এদিন এই একমাত্র বড় শয়তানের উপরই সব হাজী পাথর মারেন। প্রত্যেকে ৭টি করে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়।

আমরা দলবদ্ধভাবে পায়ে হেটে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে জামারাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। অনেক লোকের ভিড়। কাফেলা কাফেলায় ইহরাম পরনে হাজীরা মার্চ করে করে জামারাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। ভিড় দেখে সত্যিই ভয় লাগে। কিন্তু ভরসা শুধু আল্লাহ্‌র উপর। রাস্তায় দু'টি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ আছে। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে এসব সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করা হয়েছে। উভয় ট্যানেলে একাধিক প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক ফেন দ্বারা অক্সিজেনের নিশ্চয়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই ফেনগুলো অনবরত একটি বিকট শব্দ করছিল। মনে হচ্ছিল বিমানের জেট ইঞ্জিনের শব্দ। চলার মাঝে একটি স্বাভাবিক গতি আছে। আমাদের কাফেলার অনেকেই পেছনে পড়ে যান। কাফেলার আমীর ক্বারী উবায়দুল্লাহ আমিনী, স্থানীয় বাঙালি সাহায্যকারী ছেলে হায়দর আলী এবং আমি সবদিকে নজর রাখছিলাম। মানুষ খুব সহজেই হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

আধঘণ্টা ভিড়ের মধ্যে চলার পর সবাই বড় শয়তানের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখা গেল কয়েকশ' লোকের একদল কাফেলা দ্রুত এগুচ্ছেন। নারী ও পুরুষ। তাদের গতিবিধিতে সহজেই বুঝা যায়, এরা সিরিয়াস! আমরা থেমে গেলাম। এদেরকে আগেই যেতে দেওয়াটা সঙ্গত মনে করলাম। এরপর হাতে হাত ধরে আমরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি করতে করতে অগ্রসর হলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো একেবারে কাছে গিয়ে পৌঁছার পর পাথর নিক্ষেপ করবো। মানুষের প্রচণ্ড চাপ। কোন কোন সময় কাঁধে এমন চাপ সৃষ্টি হচ্ছিলো যে, মনে হলো এক্ষুণি পড়ে যাবো। যা হোক, শয়তানের প্রতীক ঐ পিলারটির কাছে পৌঁছার পর আমরা পাথর ছুঁড়তে শুরু করলাম।

পেছন থেকে অনেকে পাথর ছুঁড়ে মারছেন। আমরা ছিলাম নীচে- গ্রাউন্ড ফ্লোরে। ব্রিজের উপর থেকেও অসংখ্য লোক পাথর মারছেন। প্রচণ্ড বৃষ্টির মতো পিলারের গায়ে অনবরত কঙ্কর পড়ছে। এক পর্যায়ে পেছন থেকে ৩-৪টি পাথর আমার মাথায় এসে পড়লো! আমি কিছুটা নত হলাম। পাথরগুলো আয়তনে ছোট ছিলো, তাই কোন ক্ষতি হয় নি। আমার পাশের এক ব্যক্তি ছিলেন অপেক্ষাকৃত লম্বাকৃতির। তার উপর একটার পর আরেকটা পাথর পড়তে লাগলো। আমি

বললাম, মাথা নত করুন। তার অবয়বে ভীষণ আতঙ্কের ছায়া। পাশেই ছিলেন তবারক আলী, তার কপালে একটি বড় আকারের পাথর পতিত হলো, এতে মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসলো। আমি সামনের দিকে তাকালাম। পিলারের উপর চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। মনে হলো অগণিত পাথরের প্রচণ্ড আঘাতে পিলারটি কাঁপছে! পাথরগুলো পিলারের গায়ে লেগে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করছে। আমার কাছে মনে হলো এই দৃশ্যটি যেনো কোথাও দেখেছি! হঠাৎ মনের মধ্যে এক ভীষণ শক্তি অনুভূত হলো।

এরপর এই দু'আটি পাঠ করলাম। "**বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মাজআলহু হাজ্জাম মাবরূরান ওয়া জামবাম মাগ্‌ফুরান ওয়া সা'ইয়াম মাশকুরান্ ওয়া তিজারাতাল-লান্ তাবুর**"। অর্থাৎ: "সেই আল্লাহ্‌র নামে, যিনি সবার বড়। হে আল্লাহ্! তুমি আমার হজ্জ কবুল কর, গোনাহরাশি মাফ কর, আমার প্রচেষ্টাকে ফলবতী কর, এই ব্যবসাকে এমন ব্যবসায়ে পরিণত কর যাতে কোন ক্ষতি নেই।"

পাথর মারা শেষ হলো। পবিত্র হজ্জপালনে এই পাথর মারাই সর্বাপেক্ষা কঠিন বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। বাস্তবেও তাই। কিন্তু এ কঙ্কর মারতেই হবে। এটা হচ্ছে হজ্জের ওয়াজিব। আমার ব্যক্তিগত কথা হলো, শয়তানকে পরাজিত করাই হচ্ছে মানবজীবনের সর্বোচ্চ জীবন-দর্শন। তবে তাকে পরাজিত করা কঠিন কাজ। কারণ শয়তান আমাদের নফ্‌সের সঙ্গে কারসাজি করে। নফ্‌সে আম্মারা নামক যে জিনিসটি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান তা শয়তানের বন্ধু। এই নফ্‌সে আম্মারাকে কুরবানী করা হচ্ছে মু'মিনদের জীবন-সাধনা। হজ্জের সময় শয়তানকে মারা তাই সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। এ ওয়াজিব পালনে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হোন। আমরা সেদিন শয়তানকে কঙ্কর মারার পর মক্কায় ফিরে যাই। গিয়ে জানতে পারলাম, এদিন ভোরে শয়তানকে কঙ্কর মারতে গিয়ে ৩৫ জন হাজী প্রাণ হারিয়েছেন। আল্লাহ্ তাদের সবাইকে জান্নাত দান করুন। আমীন।

বর্তমানে কঙ্কর নিক্ষেপের স্থানটি সৌদি সরকার কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে সমুন্নত করেছেন। পাঁচ তলাবিশিষ্ট সেতু বানিয়েছেন। নিক্ষেপের সেই পিলার আর নেই। সেখানে তৈরী করা হয়েছে বিরাট বিরাট দেওয়াল। সুতরাং কঙ্কর নিক্ষেপ এখন অনেকটা সহজ।

কুরবানী ও হাল্‌ক্ব

বড় শয়তানকে কঙ্কর মেরে আমরা মিনায় ফিরে আসলাম কুরবানীর জন্য। আমরা ছিলাম 'তুর্কি ও পশ্চিম ইউরোপ' থেকে আগত হাজীদের এলাকায়। মিনার অপরপ্রান্তে মুজদালিফার নিকটেই মানচিত্রে লাল রংয়ে চিহ্নিত সারিবদ্ধভাবে স্থাপিত অসংখ্য খিমায় পূর্ণ এই এলাকাটি। জামারাত এলাকা থেকে দীর্ঘ দু'টি ট্যানেল পেরিয়ে পায়ে হেটে আমরা খিমায় ফিরে আসলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও খানা-পিনা সেরে দলে দলে চলে গেলাম কুরবানীর স্থানে। আমাদের খিমার নিকটস্থ পাহাড়ের অপরপার্শ্বে আল-মু'আসিম নামক অঞ্চলে কুরবানীর নতুন স্থানটি। পায়ে হেঁটে যাত্রা। কোন গাড়ি-টাড়ি নেই। পাহাড়ের নীচ দিয়ে এক জোড়া চওড়া ট্যানেল কেটে দেওয়া হয়েছে। হাজীদেরকে এই ট্যানেল পেরিয়ে কুরবানীর বিরাট এলাকায় যেতে হয়। আমরা কুরবানীর স্থান থেকে অপেক্ষাকৃত নিকটে ছিলাম। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই গন্তব্য স্থানে যেয়ে হাজির হলাম। পরনে তখনও ইহরাম। রক্তের গন্ধে পুরো পারিপার্শ্বিকতা সয়লাব। বিরাট বিরাট টিনশেড অর্ধ-দেওয়াল বিশিষ্ট ঘরের মধ্যে অগণিত বকরি ও দুম্বা চোখে পড়লো। একটি ছোট্ট জায়গায় যেয়ে কুরবানীর পশু ক্রয়ের জন্য লাইন বাঁধতে হয়।

দশ মিনিট লাইনে দাঁড়ানোর পর আমরা একই সাথে ১০টি দুম্বা (তখন ৩০০ রিয়াল একেকটি) উপযুক্ত মূল্য চুকিয়ে ক্রয় করলাম। আমাদের ক্রয়করা দুম্বা তখনও দেখি নি! ১০টি ক্রয় হয়েছে- এ মর্মে রসিদ দেওয়া হয়েছে মাত্র। রসিদ নিয়ে চলে গেলাম কুরবানীর বিল্ডিংয়ে। রসিদ ছাড়া কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। যা হোক, সেখানে পৌঁছে নিজে পছন্দ করে একটি দুম্বা কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করলাম। ওখানকার লোকেরা বেশ সাহায্য-সহায়তা করলেন। আমার দুম্বাটি জবাইয়ের সময় আমি একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। গলে ছুরি লাগানোর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কালো রংয়ের ফুটফুটে দুম্বাটি আমার দিকে চেয়ে একটি ডাক দিলো। আমার কানে স্পষ্ট ভেসে আসলো কালিমা তায়্যিবার পবিত্র বাক্য, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ!" আমি চমকে উঠলাম। কে এই বাক্য উচ্চারণ করলো? আশে পাশে দাঁড়ানো হাজীদের দিকে তাকালাম। না, তাঁরা কেউ এ পবিত্র বাক্যটি শোনেন নি। আমি ভাবলাম, দুম্বাই কী তা পাঠ করলো কুরবানী

হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে! নাকি অজান্তে আমার ক্বলবের মধ্যে এর আওয়াজ উঠেছে? একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সম্যক অবগত।

কুরবানী শেষে আমরা বাইরে এসে পড়লাম। একটি 'কুবরি'র (অভারব্রিজ) নীচে এসে দেখি বেশ ক'জন নাপিত হাজীদের মাথামুণ্ডন করছেন। এই নাপিতদের প্রায় সকলেই পাকিস্তানি বংশোদ্ভুত। একজন ইহরাম পরাবস্থায় মাথামুণ্ডানোর কাজ করছিলো দেখে আমাদের কাফিলা মুদির ক্বারী উবায়দুল্লাহ আমিনী সাহেব তাকে ধমক দিয়ে বললেন, হে মিয়া! তুমি দেখছি নিজে এখনও হালাল হও নি! তুমি কেনো অপরকে মাথা মুণ্ডানোর কাজ করছো? এটা যে নিয়মবহির্ভূত কাজ। সে তাঁর কথায় মাথা মুণ্ডানোর কাজ থেকে বিরত রইলো।

লক্ষ্য করলাম কেউ কেউ সামান্য চুল ছেঁটে ওয়াজিব সেরে নিচ্ছেন। তবে মাথা মুণ্ডানো উত্তম এবং তা সুন্নাত। কারণ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেল,

قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ

-"মাথামুণ্ডনকারীর উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক, বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর যারা মাথা ছেঁটেছেন তাদের উপরও? তিনি বললেন, মাথামুণ্ডনকারীর উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক, আবার বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর যারা মাথা ছেঁটেছেন তাদের উপরও? তিনি এবারও বললেন, মাথামুণ্ডনকারীর উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক! সাহাবায়ে কিরাম আবার বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা মাথা ছেঁটেছেন তাঁদের উপরও? তিনি বললেন, এবং যারা মাথা ছেঁটেছেন তাদের উপরও।" (সহীহ মুসলিম)

মাথা মুণ্ডানোর মাধ্যমে মালিকের সামনে গোলামের আনুগত্যের চরম বাধ্যতার স্বীকৃতি ফুটে ওঠে। যারা মাথা ছাঁটেন তাদের ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। উপরোক্ত হাদীস শরীফ এর প্রমাণ। কিন্তু কোন্‌টি করা উচিৎ তা পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে

এই পবিত্র ভূমিতে এনে সারা জীবনের গুনাহ্ মাফির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মালিকের পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি এই বিরাট করুণার স্বীকৃতিদান আদৌ কোন গোলামের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এরপরও ...।

যা হোক, আমি একজন 'হালাল' নাপিত দ্বারা মাথা মুণ্ডিয়ে নিলাম। এরপর একটু দূরে সরে যেয়ে গায়ের ইহরামের কাপড়ের দু'প্রান্তে ধরে হাতদ্বয় প্রসারিত করলাম, উদ্দেশ্য কাপড় থেকে চুল ঝেড়ে ফেলা। এ সময় এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার আমার নিকট প্রকাশ পেল।

আমি চোখ দু'টো বন্ধ করে ইহরামের কাপড় ঝাড়ছিলাম। এতে মনে হচ্ছিলো পাখিরা যেভাবে তাদের উভয় ডানা উড়ন্ত অবস্থায় নাড়তে থাকে- আমি যেনো তা-ই করছি। বেশ ক'দিন একনাগাড়ে ইহরাম অবস্থায় থাকার পর আজ তার অবসান ঘটেছে। বন্ধ চোখ দু'টো অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠলো। হঠাৎ মানসপটে ভেসে আসলো একটি অত্যাশ্চর্য দৃশ্য। দেখছিলাম, অসংখ্য মানুষ আকাশে উড়োউড়ি করছেন! তাঁদের আছে পাখির মতো দু'টি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের ডানা। আমি বুঝতে পারলাম- 'এতো জান্নাতে বিচরণশীল সৌভাগ্যশীল মানুষ!' মুহূর্তে আমি প্রকৃতিস্থ ফিরে পেলাম। এক বেহেশতী অনুপম মনমাতানো আনন্দনৃত্যে রত আমার অন্তরাত্মা। এরপর সব স্বাভাবিক! আমি আল্লাহর দরবারে তাঁর অসীম নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে লাগলাম। বার বার বললাম, '**সুহবানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজীম**'।

আমরা যেখানে কুরবানী দিলাম সেখান থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের অপরপ্রান্তে উট ও গরু কুরবানীর স্থান। ডান দিকে মোড় নিয়ে সেখানে হেঁটে যেতে হয়। এ বছর আমাদের কাফিলার বেশ ক'জন উট কুরবানী করেছিলেন। আমি ও অন্যান্য ক'জন ১১ জিলহাজ্জ উট ক্রয় করে কুরবানী করার পুরো ব্যাপারটির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। উল্লেখ্য দমে শুকুর বা কুরবানী আদায়ে একটি উট বা গরু দ্বারা ৭টি নাম দেওয়া যায়। সুতরাং কয়েকজন মিলেও উট কুরবানী করা সম্ভব যা বকরি বা দুম্বা দেওয়া থেকে আফজল। কারণ বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০০টি উট কুরবানী করেছিলেন। সুতরাং কুরবানীর পশু হিসাবে উট দেওয়া উত্তম। অবশ্য দুম্বা বা বকরির তুলনায় উটের (এক নামের) মূল্য কিছুটা বেশী।

মিনায় উট কুরবানীর স্মৃতি যা আমার মধ্যে স্থায়ী রেখাপাত করেছে তাহলো, দর্শক গ্যালারি ও সেখানে অবস্থান করে উট কুরবানীর দৃশ্য। একটি উটের সাথে আমি নিজেও (অতিরিক্ত কুরবানী দেওয়ার অংশ হিসাবে) শরীক ছিলাম। আমরা টিকিট দেখিয়ে গ্যালারিতে আরোহণ করলাম। বেশ লোক সেখানে। উটগুলোর একেকটি কুরবানীর স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। প্রতিটির গলায় ঝুলছে কুরবানী দাতার নামের তালিকাসর্বস্ব গালভেনাইজ তারের রিং। আমার উট ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। অন্যান্যদের মতো লক্ষ্য করলাম আমরটিও কুরবানীর স্থানে যেয়ে অনড় অবস্থায় গলা টেনে দাঁড়িয়ে গেল। কসাই বেশ বড় একটি শানিত ছুরি হাতে কাছে এসে নামগুলো পড়ে নিল। তারপর ‘বিসমিল্লাহ, আল্লা-হু আকবার!’ সজোরে উচ্চারণ করে দাঁড়িয়ে থাকা উটের গলায় ছুরি দিয়ে প্রচণ্ড বেগে টান দিল। কেটে গেল উটের শাহরগ। মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে আসলো বেগবান রক্তের ধারা। মিনিট খানেক উটটি কোনমতে দাঁড়িয়ে থাকলো। এরপর ধীরে ধীরে সে ফ্লোরে পড়ে গেল। সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হওয়ার পর উটটিকে সেখান থেকে মেশিনের মাধ্যমে সরিয়ে নেওয়া হলো। তারপর অন্যরা এসে চামড়া তুলতে লাগলো। আমি এই রক্তবন্যার দৃশ্য দেখে তেমন বেশী অস্বস্তি বোধ না করলেও অনেকে দেখলাম নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা দ্রুত গ্যালারি থেকে নেমে আসলেন। রক্ত দেখলে যাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তাদের জন্য ঐ উট কুরবানীর গ্যালারিতে যাওয়া সঠিক হবে না। তবে এই কুরবানী আল্লাহর জন্য। এটা আদায়ের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি কামনাই আমাদের উদ্দেশ্য। কুরবানীর টিকিট দিয়ে মাংস আনা যায়। আমরা কেউ আনি নি। বরং সেখানকার কিছু গরীব লোককে তা বন্টন করে দিলাম।

তাওয়াফে জিয়ারত

কয়েক বৎসর পরের কথা। আমি একবার মিনা থেকে মক্কা শরীফ যাচ্ছিলাম লাইটেসযোগে। উদ্দেশ্য হজ্জের তৃতীয় ফরয তাওয়াফে জিয়ারত করবো। গাড়িতে আমাদের সঙ্গে ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ এক মহামনীষী। ‘মযযূব ইলাল্লাহ’, কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমিনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সেদিন ছিলো ১০ জিলহাজ্জ। কোন এক কারণবশত কুরবানী করতে

অপারগ হওয়ায় মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হতে পারি নি। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিয়েছি মুহরিম অবস্থায়ই হজ্জের তৃতীয় ফরয 'তাওয়াফে জিয়ারত' সেরে নিতে। আর মুহরিম ও স্বাভাবিক অবস্থা- এ দু'য়ের মধ্যে বিরাট তফাৎ বিদ্যমান। জানি না, অন্যের ক্ষেত্রে তা কিরূপ- কিন্তু আমার বেলা এই তফাৎ স্বতঃস্ফূর্ত ও বাস্তব। গাড়ি ছুটে চলছে মক্কা মুয়াজ্জমার দিকে। জান্নাতুল মা'লা কবরস্থানের নিকট আসতেই এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার আমার চোখে ধরা দিল। অভারব্রিজ থেকে হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিআল্লাহু আনহার করবটির সবুজ গেট স্পষ্ট দেখাচ্ছে। আমি সেদিকে তাকালাম। সালাম জানালাম। একটা দৃশ্য ভেসে এলো ... আমার চোখ দু'টো অশ্রুতে ভিজে গেল। অন্তঃপুরে যেনো ইশকের সিক্ত পানীয়ের বন্যা! আমি অপূর্ব এক প্রশান্ত সাগরের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছি- কিন্তু ... চোখে জল, শরীরে রোমাঞ্চকর শিহরণ। আমার প্রিয় মুর্শিদকে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত! অনুগ্রহ করে বলুন- হজ্জের ফরয তাওয়াফকে কেনো 'তাওয়াফে জিয়ারত' বলা হয়? হযরত আমার দিকে তাকালেন। চোখ বন্ধ করে বললেন, মনে করো তুমি আল্লাহর সঙ্গে 'জিয়ারত' করবে! আমি চমকে উঠলাম। কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি! আমি কিছু বললাম না। শুধু মনে মনে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে ফরিয়াদ করলাম, 'হে প্রভু! আমি অধম তোমার বড়ত্ব, মাহাত্ম্য, অসীম গুণাবলীর একটুকুও ভাষায় ব্যক্ত করার ক্ষমতা রাখি না। এরপরও আমি তোমার নিজের অসীম গুণাবলীসম গুণগান করে আকুল আবেদন জানাচ্ছি, তাওয়াফে জিয়ারতের সময় তোমার পবিত্র দীদার দ্বারা এই অসহ পিপাসার্ত শুষ্ক হৃদয়পূরীকে আবেগ-আপ্লুত করে দিও। তুমি বাইতুল্লাহ্‌র মেহমান, তোমার মেহমান বানিয়ে অধমকে দূরদেশ থেকে ডেকে নিয়ে এসেছ। আমি নিঃস্ব তাই মেজবানের সন্তুষ্টি কামনায় হাদিয়া হিসাবে কিছুই আনতে অপারগ ছিলাম। হ্যাঁ, শুধুমাত্র তুমি ও তোমার হাবীবের শিখিয়ে দেওয়া সেই অপূর্ব কালিমা, **লাব্বায়িক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক! লাব্বাইকা লা-শরীকালাকা লাব্বায়িক! ইন্নাল হামদা, ওয়ান্নি'মাতা, লাকাওয়াল মুলক! লা-শারীকালাক!** হে প্রভু! আমার অন্তরের আকুতিটুকু তুমি আমার চেয়ে বেশী জ্ঞাত- তৃষ্ণাতুর হৃদয়ে একটুকু ইশকের সিক্ততা কামনা করছি মাত্র ... ।

ফিরে আসছি ২০০১ সালে। প্রত্যেক বৎসর ৯ জিলহাজ্জ অর্থাৎ আরাফাত দিবসে যখন বিশ্বের দেড় শতাধিক দেশ থেকে শতভাষী সববর্ণের আল্লাহর মেহমান বেহুঁশ বেকারার হয়ে আরাফাতের প্রশস্ত, উন্মুক্ত ময়দানে মা'বুদের অনুগ্রহের অন্বেষায়

ক্রন্দনরত। তখন বাইতুল্লাহ্‌কে কর্তৃপক্ষ একখানা নতুন কালো গিলাফ পরিয়ে দেন। এ যেনো, তাওয়াফে জিয়ারতের জন্য আল্লাহর ঘরকে অসংখ্য ভক্তের প্রেমময় দর্শনের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি।

আহ! মসজিদুল হারাম ও বাইতুল্লাহ্‌ আজ কী অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে! তিনদিন পূর্বে ৮ জিলহাজ্জ মেজবানের বাড়ি থেকে দূরে গিয়েছিলাম। এখন ফিরে এসেছি, আগ্রহ ভরে প্রাণ খুলে বাইতুল্লাহ্‌কে দেখবো, তাওয়াফ করবো। কিন্তু মেজবান আমাকে পুনরায় পাঠাবেন মিনায়। সেখানে গিয়ে শয়তানকে দু'দিন কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে ফিরে আসতে হবে। হৃদয়ের পিপাসা নিবারণ করতে বাইতুল্লাহ্‌ শরীফের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলাম অনেক্ষণ।

তাওয়াফে জিয়ারতে স্বভাবত মানুষের প্রচণ্ড ভিড়। ১০ জিলহাজ্জ থেকে ১২ জিলহাজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত এই তাওয়াফ অব্যাহত থাকে। সাত চক্কর ও ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায আদায় করতে গড়ে দুই-আড়াই ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়। ভিড়ের প্রচণ্ড চাপ হেতু বাইতুল্লাহ্‌ শরীফের নিকটে যেয়ে চক্কর দেওয়া খুব কঠিন কাজ। যা হোক, কোনমতে বাইরদিকে অবস্থান নিয়ে ধীর গতিতে সাত চক্কর পূর্ণ করলাম। এরপর কিছুক্ষণ হোটেলে অবস্থানের পর আবার মিনায় চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম।

রাত ১১টায় আমরা ক'জন বের হয়েছি। এ রাত লক্ষ লক্ষ মানুষ তাওয়াফে জিয়ারত সেরে মিনায় ফিরে যাচ্ছেন। মুয়াল্লিমের পক্ষ থেকে কোন বাস সার্ভিস নেই। যারা গাড়িতে যাবেন ছোটবড় বিভিন্ন ধরনের গাড়ি রিজার্ভ করতে হবে। সাধারণত ৫-৭ জনের কাফিলা একেকটি গাড়ি রিজার্ভ করে যাত্রা করেন। যারা ইতোমধ্যে হজ্জপালন করেন নি, তাদের জন্য কিছুতেই একা বা এমন গ্রুপের সঙ্গে যেতে নেই যারা অনভিজ্ঞ। যদি কেউ এভাবে 'আমিরহীন' অনভিজ্ঞ কাফিলা কিংবা একাই মিনায় যাত্রা করেন তাহলে প্রায় ১০০ পার্সেন্ট গ্যারান্টি তিনি বা ঐ পুরো গ্রুপ হারিয়ে যাবেন! সুতরাং কয়েকজন মিলে রাস্তা জানেন এমন অভিজ্ঞ আমির নির্বাচন করে যাত্রা করতে হবে। অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, মিনায় যাত্রার সময় নফস ও শয়তান মিলে হাজীদেরকে ধোঁকা দেয়! আমিরের কথা মানা একান্ত জরুরী। দেখা যায়, মানুষ এতো ধৈর্যহারা হয়ে পড়েন, মিনায় পৌঁছতে দেরী হচ্ছে দেখে রাগে-গোস্বায় চেঁচামেচি করতে করতে আমিরের কথা না মেনে গাড়ি থেকে নেমে যান। গর্বভরে বলেন, "আমি তাঁবুতে যেতে পারবো! আমি হেঁটে যাচ্ছি"। কিন্তু পরে দেখা যায়, ১১ জিলহাজ্জ দুপুর ১২ ঘটিকার সময়ও ঐ লোকটির কোন খবর নেই! সুতরাং এভাবে স্বেচ্ছায় হারিয়ে যাওয়া এবং সারারাত মিনায় ঘুরাঘুরি ও

ভীষণ কষ্ট-পেরেশানীতে পতিত হওয়া কতটুকু যুক্তিসম্মত তা পাঠকরা একটু ভেবে দেখুন।

এ রাত গাড়িযোগে মিনায় ফিরে যেতে ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লাগে। তবে মিনা আসলে তেমন দূরে নয়। পায়ে হেটে মাত্র দেড়-দুই ঘণ্টার মধ্যে খিমায় পৌঁছা যায়। সুতরাং আমার পরামর্শ হলো, যদি সম্ভব হয় অভিজ্ঞ কোন একজনকে সাথী করে পায়ে হেটে মিনায় ফিরে যাবেন। এটুকু বলার পরও একটা বিষয় সবাইকে মেনে নিতে হবে, মিনায় এদিন না হয় অন্যদিন হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আল্লাহর জিকির করতে করতে ধৈর্যসহ খোঁজতে থাকলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নিজের খিমায় নিয়ে হাজির করবেন। আর যে কোন মূল্যে সময়মতো নামায আদায় করতে হবে। দেখবেন রাস্তায় রাস্তায় লোকজন নামাযের সময় জামাআতে দাঁড়িয়ে গেছেন। আপনিও দাঁড়িয়ে যাবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনি মুসাফিরী নামায তথা কছর আদায় করবেন। কিন্তু ইমাম যদি 'মুক্বিম' হন তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ, ইমাম মুক্বিম হলে আপনিও মুক্বিমের মতোই নামায আদায় করবেন। যেভাবে মক্কা ও মদীনা শরীফ থাকাকালে হজ্জযাত্রীরা উভয় মসজিদে জামাআতে নামায আদায় করে থাকেন, ঠিক একজন মুক্বিমের মতো।

দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা পর আমরা ৫-৭ জন খিমা থেকে বেশ দূরে মিনার উপকণ্ঠে এসে গাড়ি থেকে নামলাম। ড্রাইভার জানালো, মিনার ভেতরে গাড়ি যেতে পারবে না, পুলিশ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে। প্রত্যেকে নিজের পকেট থেকে ত্রিশ রিয়াল করে ভাড়া প্রদান করলাম। আমাদের কাফিলায় একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমির ছিলেন। তিনি আল্লাহর নাম লয়ে আমাদেরকে নিয়ে মিনায় প্রবেশ করলেন। প্রায় আধঘণ্টা পর ফযরের নামাযের কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা খিমায় প্রবেশ করলাম। লক্ষ্য করলাম তখনও অনেকে আসেন নি। অনেকে হারিয়ে যান। অবশ্য ভোর ৯-১০ ঘটিকার মধ্যেই সবাই খিমায় এসে হাজির হলেন। এরপর শুরু হলো, রাস্তা পাড়ি দেওয়ার বিভিন্ন ধরনের চিত্তাকর্ষক বর্ণনাদানের পালা। অবশ্য, যারা হারিয়ে গিয়েছিলেন তা স্বীকার করতে আমতা-আমতা বোধ করছিলেন- এই যা!

যা হোক পরের দিন, অর্থাৎ ১১ জিলহাজ্জ আবারও শয়তানকে কঙ্কর মারতে হবে। এদিন ছোট, মাঝারি ও বড় শয়তানকে মারতে হয়। সাধারণত এই দ্বিতীয় দিনে ভিড় বেশী থাকে। কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হলো জাওয়াল থেকে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত (অবশ্য দুর্বল, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও মহিলারা রাতেও মারতে পারেন।)। কিন্তু অধিকাংশ হাজী জাওয়াল

শুরুর বেশ পূর্বে জামারাত এলাকায় যেয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। তাদের উদ্দেশ্য, মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে যুহরের আযানধ্বনি কর্ণগোচর হওয়া মাত্র ছুটে যাবেন কঙ্কর মারতে। মানুষের এই মনোভাব হেতু জামারাত এলাকায় ছোট শয়তানের চতুর্দিকে মানুষের প্রচণ্ড ভিড় হয়। আমাদের কাফিলার পরিচালক ক্বারী উবায়দুল্লাহ আমিনী বললেন, আমরা জামারাতে যাবো আসর নামায শুরুর আধ-ঘণ্টা পূর্বে। রাস্তায় আমরা আসরের নামায আদায় করবো। এরপর জামারাতে মাগরিবের পূর্বে পাথর মেরে মিনায় ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ! দীর্ঘদিন কাফিলা পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমি তা সাথে সাথে বুঝতে পারলাম। তবে ... কাফিলার কিছু সদস্য উত্তেজিত হয়ে ওঠলেন। তারা অবশ্যই জাওয়াল শুরুর পরই পাথর মারবেন। বার বার বুঝানোর পরও তারা মানলেন না। দুপুরে চলে গেলেন তিন-চার কিলোমিটার দূরে জামারাতের উদ্দেশ্যে। রাতে এদের ফিরে আসতে বেশ দেরী হলো। জানা গেল, একব্যক্তি তার স্ত্রীকে হারিয়েছেন। আরো তিন-চার জনের খবর নেই! পাথর মারার সময় প্রচণ্ড চাপে পড়ে ভীষণ ব্যথা পয়েছেন। একজন বললেন, আমার পাথর মারা হয়েছে কি না জনি না! মানুষের ধাক্কায় সবগুলো পাথর হাত থেকে পাড়ে যায়। এরপর আর কী করবো, নীচে থেকে পাথর কুড়িয়ে নিয়ে কাজ আদায় করেছি! এরূপ কথাবার্তা শোনে পরিচালকের চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করলো। বললেন, আমীরের নির্দেশ না মানার খেসারত এরূপই হয়ে থাকে। যাক, আমরা পরিচালকের সাথে বেশ বড় একটি দল সময়মতো জামারাতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নাম নিয়ে যাত্রা করলাম।

পথে প্রচণ্ড ভিড়। দু'টি ট্যানেল পেরিয়ে জামারাতে যেতে হয়। দ্বিতীয়টি খুব লম্বা। প্রায় ২০ মিনিট হাঁটার পর বাইরে এসে এক জায়গায় দেখলাম লোকজন রাস্তার পাশে নামায পড়ছেন। আমরা এখানে আসরের নামায আদায় করে নিলাম। কিবলার দিকে জামারাত সেতুটি চোখে পড়লো। নামায শেষে মুসাল্লায় বসে তাসবিহ পাঠ করছি। এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার আমার অন্তরদৃষ্টিতে ভেসে আসলো। দেখলাম, জামারাতের উভয় দিকের পাহাড়ের মাঝখানে এক বিরাট লম্বা শ্বেত বর্ণের স্তম্ভ। পরিষ্কার দেখলাম, আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে। আমি সজোরে 'আল্লাহু আকবার!' ধ্বনি তুললাম। সাথীরা সবাই আমার দিকে অবাক দৃষ্টিকে তাকালেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ঐ দৃশ্য এখন মিলিয়ে গেছে। ভাবলাম, এ আমি কী দেখলাম? শয়তানই কী আমাকে ভয় দেখানোর ছলে এরূপ করেছে! বুঝতে পারলাম না। তবে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে লাগলাম। ইতোমধ্যে পরিচালক নির্দেশের সুরে বলেছেন, "চলুন! শয়তানকে পাথর মেরে বিতাড়িত করি!"

আমরা আবার মার্চ করে চলতে লাগলাম জামারাতের দিকে। রাস্তায় এক দু' জায়গায় মানুষের খুব চাপ। আমাদের পরিচালক সামনে ছিলেন। আমি তাঁর পাশে। তিনি খুব সতর্কতাসহ সবাইকে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। প্রয়োজনে দাঁড়াচ্ছেন, অন্য বড় কাফিলাকে যেতে দিচ্ছেন বিনা বাধায়। অপরকে যে সাহায্য করে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। আমরা মাটির লেবেলে কঙ্কর নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিলাম। জামারাতুস্ সুগরার নিকটে পৌঁছতেই এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য চোখে ভেসে আসলো। অসংখ্য মানুষ ছোট্ট পিলারটির চতুর্দিকে। কেউ নিকটে কেউ দূরে অবস্থান নিয়ে দ্রুত পাথর নিক্ষেপ করছেন। চতুর্দিকে প্রচণ্ড বেগ ও উচ্চ স্বরে লোকজনের তাকবীর ধ্বনি ও হাউমাউ শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে। দৃশ্য ও শব্দতরঙ্গের সমন্বয়ে যে অদ্ভুত ও ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা অন্য কোনো স্থানে কোথাও হয় না। পরিচালক ক্বারী সাহেব বললেন, "আমি সামনে থাকবো। তাকবির ধ্বনি দিয়ে সবাইকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়বো। আপনারা আমার নির্দেশ না শোনে একটিও পাথর মারবেন না। আমরা সামনে পিলারের অতি নিকটে যেয়ে সুন্নাত মুতাবিক কঙ্কর নিক্ষেপ করবো ইনশাআল্লাহ! যদি কেউ হারিয়ে যান তাহলে সেতুর ঐ পিলারটির নিকট যাবেন। সেখানে আমরা সবাই থাকবো।"

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা ক্বারী সাহেবের প্ল্যান মুতাবিক মোটামুটি শান্তভাবেই ছোগরা শয়তানকে পাথর মারলাম। কেউ হারিয়ে যায় নি। তবে এক দু'টো অপেক্ষাকৃত বড় আয়তনের পাথর দু'এক জনের মাথা ও পিঠে পতিত হয়েছে! সিরিয়াস কোন ইঞ্জুরী থেকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেছেন! সবাই ঐ পিলারের নিকট একত্রিত হওয়ার পর কিবলামুখী হয়ে দু'আ করলাম। অনুরূপ পদ্ধতিতে উসতা ও কুবরা শয়তানকেও পাথর মারলাম। তবে বড়টিকে মেরে আর দু'আ করলাম না। এটাই নিয়ম। আমরা ডানে ঘুরে খিমায় ফিরে আসার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। ইশার নামাযের পূর্বেই তাঁবুতে পৌছলাম।

পরদিন অর্থাৎ ১২ জিলহাজ্জ শেষবারের মতো পাথর মেরে আমরা মাগরিবের পূর্বেই মিনা এলাকা ছেড়ে মক্কা শরীফ চলে আসলাম। বড় শয়তানের জায়গা থেকে কিছুদূর পায়ে হেঁটে চললেই মিনার সীমানা থেকে বের হওয়া যায়। তবে কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় মাগরিবের পূর্বে মিনার সীমানা থেকে বেরুতে সক্ষম না হোন, তাহলে তার জন্য এদিন মিনায় রাত কাটিয়ে পরদিন অর্থাৎ ১৩ জিলহাজ্জ একই নিয়মে তিন শয়তানকে পাথর মারা ওয়াজিব হবে।

সেদিন অর্থাৎ ১২ই জিলহাজ্জ মক্কায় হারাম শরীফ এলাকায় ভীষণ বৃষ্টি হলো। হারাম শরীফের চত্বরে পায়ের গিরা পর্যন্ত পানি জমে গিয়েছিলো। অনেকে এসময় মহাখুশিতে এই পানিতে পড়ে গড়াগড়ি করেছেন। হজ্জের সময় হারাম শরীফ এলাকায় বৃষ্টি হওয়াটা আল্লাহ্‌র রাহমাতের নিদর্শন। আলহামদুলিল্লাহ! এবার হজ্জের সময় আরাফাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত হারাম শরীফে বৃষ্টি হলো। হাজীদের অনেকেই এই রাহমাতের বৃষ্টির কথা বলাবলি করেছেন। পরবর্তীতে মদীনা শরীফেও বৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া আমরা ফিরে আসার দিন জিদ্দায়ও প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে। হাজীদের কেউই বোধহয় এবার বৃষ্টির পানিতে সিক্ত না হয়ে ফিরেন নি। পবিত্র খানায়ে কাবায় মহান প্রভুর অসীম করুণার নিদর্শন, রাহমাতের বারিধারা, মৃত জমিনকে জিন্দা করার কৌশল, জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে আমাদের হজ্জের জরুরী কর্তব্যগুলো শেষ করালেন। বাকী রইলো একটি কাজ- তাওয়াফে বিদা। মা'বুদের দরবারে হাজার কোটি শুকরিয়া।

বিদায়, হে বাইতুল্লাহ্‌র মেহমান!

আল্লাহর মনোনীত মক্কা মুয়াজ্জমা মু'মিনদের জন্য সৃষ্ট জগতে সর্বাপেক্ষা পবিত্রতম, মর্যাদাশীল, নিরাপত্তা ও শান্তির বাসস্থান। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এ খবর জানিয়ে দিয়েছেন: وَهٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ -"এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর।" (সূরা ত্বীন (৯৫): ৩)

আর নিরাপত্তার শহর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস-সালামের কামনা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় খালীলের এই আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর পবিত্র কালামে:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

-"যখন ইব্রাহীম বললেন: হে আমার পালনকর্তা! এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।" (ইব্রাহীম (১৪) : ৩৫)

পাঠক! এই মহান মর্যাদাশীল বাইতুল্লাহ্‌র শহর থেকে কি কেউ বেরিয়ে পড়তে চাইবে? কিন্তু আমি তো এখানে এক কুটুম্ব- বাইতুল্লাহ্‌র মেহমান। আর কারো বাড়িতে মেহমান হলে বেশিদিন থাকার নিয়ম নেই। এতে মেজবানের বিরক্তির কারণ হতে পারে। কিন্তু বাইতুল্লাহ্‌র শহরের মেজবান তো অসীম দাতা-দয়ালু, করুণাময়। তাঁর বাড়িতে

বছরের পর বছরও মেহমান হিসাবে কাটিয়ে দিলে কোন অসুবিধা নেই। মেহেরবান মেজবান কখনও বিরক্তিবোধ করবেন না। কিন্তু মেহমান হিসাবে বে-আদবী, ভুল-ত্রুটি হওয়ার আশঙ্কা প্রবল তাই গুণিজন বলেন, মক্কা শহরে আফাকীকে বেশিদিন অবস্থান করতে নেই। এখানে একেকটি নেকী যেরূপ লক্ষটির সমান, তেমনি একেকটি বদিও লক্ষটি বদির সমান। মক্কা শরীফের মর্যাদা এমন উচ্চে, হারাম এলাকার ভেতর যদি কেউ গুনাহ করার 'নিয়ত' করে তাহলে তা গুনাহ হিসাবে লিখা হয়ে যায়। কিন্তু পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থানে গুনাহ সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত লেখা হয় না। হারাম সীমানার ভেতর বিনা কারণে গাছের ডাল ভাঙ্গা, পশু হত্যা করা, এমনটি বিড়াল-কুকুর মারাও নিষিদ্ধ।

যে দিনটি তাড়াতাড়ি না আসার জন্য মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করছিলাম, শেষ পর্যন্ত সেই দিবসটি এসে হানা দিল। ছেড়ে যেতে হবে এবার বাইতুল্লাহ্‌র শহরকে। বুকটি ধুরু ধুরু করে ওঠলো যখন সর্বশেষ তাওয়াফ তথা তাওয়াফে বি'দা পালনের জন্য মসজিদুল হারামে গেলাম। তাওয়াফ সেরে অনেকক্ষণ বাইতুল্লাহ্‌র দিকে চেয়ে রাইলাম স্থির দৃষ্টিতে। অশ্রুতে চোখ ভিজে গেল। ভাবলাম, হায়! আর কি কোনদিন এভাবে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ঘরটি দেখতে পাবো? দু'আ করলাম, প্রভু গো! তুমি আগামী বৎসরই আবার দাওয়াত করে তোমার বাড়িতে নিয়ে এসো! এর পূর্বে তুমি মৃত্যু দিও না। মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বার বার ফিরে ফিরে পৃথিবীর জমিনে প্রথম ইবাদাতগাহ বাইতুল্লাহ্ শরীফের দিকে তাকাতে থাকি। বুকটি যেনো ফেটে যাবে! মনে হলো কাবাঘর আমাকে বলছে, ওহে বাইতুল্লাহ্‌র মেহমান! তুমি আমাকে ফেলে কোথায় যাচ্ছো?

দুপুরে খাবার শেষ করে আমরা বাসে আরোহণ করলাম। শহর থেকে বেরুবার সময় মসজিদুল হারাম বার বার চোখে পড়লো। অনেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। দু'আ ইস্তিগফার করলেন। দরূদ শরীফ পড়লেন। জিকির করলেন। কাফিলা পরিচালক বাসের মাইকে বলছিলেন, একটু পরই আমরা হারাম শরীফের সীমানা ছেড়ে চলে যাবো। আপনারা দু'আ ইস্তিগফার জিকির করতে থাকেন। এখনও একবার 'আল্লাহু' বলা লক্ষবার বলার সমান। এখনও একবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা লক্ষবার বলার সমান। একটু পর এই ফজিলত আর থাকবে না।

আমাদের বাসটি দ্রুত মসজিদে তান'ঈম পেরিয়ে ছুটে চললো। হারাম শরীফের সীমানার পুরাতন দু'টি পিলার এই মসজিদের নিকটে দেখাচ্ছিল। আমার অন্তরে ভীষণ তোলপাড় শুরু হলো। সত্যিই আমরা মক্কা মুয়াজ্জমা ছেড়ে চলে যাচ্ছি! মনে পড়লো প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের দিনের কথা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফের বাইরে এসে আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে নিজের জন্মস্থানের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন:

مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِيْ أَخْرَجُوْنِيْ مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ

-"প্রিয় মক্কা! কত সুন্দর শহর তুমি, আর আমার কত প্রিয় ও ভালোবাসার তুমি! যদি আমার কওম এখান থেকে আমাকে বের করে না দিত, তাহলে তোমাকে ছাড়া অন্য কোথাও আবাস গড়তাম না, বসবাস করতাম না।" (তিরমিযি শরীফ)

হায়! আমি চলে যাচ্ছি! আমার মেজবান কবে আবার আমাকে মেহমান বানাবেন তাঁর এই পবিত্র শহরে? মনটি মুচড়াতে লাগলো। ক্বারী উবায়দুল্লাহ আমিনী সাহেব- যার ওয়াসিলায় আমি হজ্জে গমনের নিয়ত করেছিলাম। তিনি আমার অবস্থা কিছুটা অনুভব করলেন। বললেন, আমরা যদিও বাইতুল্লাহ্‌কে ফেলে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের গন্তব্যস্থল আল্লাহর হাবীবের বাড়ি, মদীনা মুনাওয়ারা। কথাটি সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরে যেনো সুপেয় সুধার মতো শীতল পানীয় হয়ে প্রবেশ করলো। ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে যেনো একটুকু সান্ত্বনার ক্ষীণ আভা। অন্ধকারাচ্ছন্ন হতাশার মাঝে আলোকোজ্জ্বল শান্তি। আমি নিজেকে সামলে নিলাম। বাইতুল্লাহ্‌র মালিক তাঁর শহর থেকে বিদায় দিয়েছেন ঠিকই। তবে পাঠিয়ে দিচ্ছেন নিজের হাবীবের বাড়িতে। গাড়ি যতোই মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে এগুতে লাগলো ততোই মনের মধ্যে আরেক তীব্র পিপাসা অনুভব হচ্ছিলো। দীর্ঘ ৯ ঘণ্টা ভ্রমণ শেষে উপস্থিত হলাম রওজা শরীফের শহর, মদীনা মুনাওয়ারার উপকণ্ঠে। এবার শুরু হলো, আত্মিক প্রচণ্ড হা-হুতাশ। কবে গিয়ে দাঁড়াবো প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকের পাশে। প্রাণভরে সালাম জানাবো, **"আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ!"**

বাইতুল্লাহ্‌র মেহমানদের সফরনামা থেকে

বাইতুল্লাহ্‌র হজ্জপালনকারী ওলিআল্লাহদের হৃদয়াকর্ষক ঘটনাবলী থেকে মানুষ যুগ যুগ ধরে আহরণ করে আসছেন দরবারে মাওলার সাথে সাক্ষাতের প্রেমাকাঙ্ক্ষা। প্রেমাসক্ত হৃদয়ের জন্য এসব ঘটনাবলী যেনো দীর্ঘ বিরহ যন্ত্রণার মাঝে সুপেয় সুধা। বাইতুল্লাহ্‌র মেহমান হওয়ার তীব্র স্পৃহা উদ্দীপক এসব কাহিনী থেকে আমরা সবাই উপকৃত হতে পারি। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় কয়েকটি মাত্র হৃদয়-নিংড়ানো বর্ণনা লিপিবদ্ধ করছি। এসব ঘটনা হযরত জাকারিয়া কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'ফাজায়েলে হজ্জ' এবং ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'ইহইয়া উলূমিদ্দীন' কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

১. হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ২৪৫ হি.) বলেনঃ আমি একদিন বাইতুল্লাহ্‌ শরীফে তাওয়াফরত ছিলাম। অনেকে বাইতুল্লাহ্‌র দিকে প্রাণখুলে তাকাচ্ছিল। এক লোক হঠাৎ এসে এই বলে দু'আ করতে লাগলেনঃ "হে আমার মা'বুদ! পলাতক আবার তোমার দরবারে এসে ধর্ণা দিয়েছে। ... হে মেহেরবান মাওলা! আমি তোমার নৈকট্যশীল বান্দা ও আম্বিয়ায়ে কিরামের ওয়াসিলা নিয়ে প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে স্বীয় মাহাব্বাতের এক পিয়ালা শরাব আমাকে পান করাও! আমি তোমার মা'রিফাতের বাগিচায় যেতে চাই, একটু গোপন আলাপ করতে চাই তোমার সঙ্গে। ... " এসব কথা উচ্চারণের সময় তার চোখের পানি টপ টপ করে ঝরছিল। কিন্তু একটু পরই দেখলাম তিনি মৃদু হেসে অগ্রসর হচ্ছেন। আমি ভাবলাম, এ লোকটি হয়তো কোন কামিল ওলি না হয় পাগল হবে। আমি তার পেছনে চললাম। তিনি ফিরে তাকিয়ে বললেন, "ওহে! তুমি আমার সঙ্গে চলছো কেন, নিজের কাজে যাও!" আমি বললাম, হযরত! আল্লাহ আপনার উপর রাহমাত নাজিল করুন! দয়াকরে আপনার নাম বলুন?। জবাব দিলেন, 'আবদুল্লাহ'। আপনার পিতার নাম? 'আবদুল্লাহ!' আমি বললাম, আবদুল্লাহ- অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা তো সকলেই। আসল পরিচয় দিন? তিনি বললেন, 'আমার নাম ছাদুন।' আমি বললাম, কী? আপনিই বুঝি সেই 'ছাদুন পাগলা!?' বললেন, "হ্যাঁ!" জিজ্ঞেস করলাম, যাদের ওয়াসিলা নিয়ে দু'আ করলেন, তাঁরা কারা? জবাব দিলেন, তাঁরা ওরা- যারা আল্লাহর দিকে এমনভাবে দৌড়েন যেভাবে প্রেমিক তাঁর প্রেমাস্পদের দিকে

দৌড়ায়। এরপর বললেন, "হে যুননূন! তুমি আসবাবে মা'রিফাত জানতে চাও? মনে রেখো, মা'রিফাতপন্থীদের দিল সর্বদা মাওলার স্মরণে আসক্ত ও আসক্তিরত কান্নায় বিজড়িত। তাঁর দরবারে তাঁরা একটি গৃহ নির্মাণ করে নেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে থাকেন, কেউ তাঁদেরকে সেখান থেকে বের করতে পারে না।"

২. হযরত বিশরে হাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ২২৭ হি.) বলেন: আমি আরাফাতের ময়দানে একব্যক্তিকে দু'আ পাঠ অবস্থায় দেখলাম। তিনি বেহুঁশ- বে-কারার হয়ে কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, "তিনি কতো বড় জাত! কাঁটাভর্তি যমিনের উপর সিজদায় রত থাকলেও দশ ভাগের এক ভাগের একভাগ পরিমাণ শুকরিয়া আদায় হবে না!" এরপর আরো বলতে লাগলেন, "হে পাক-পবিত্র মহান! শতবার অন্যায় করেও তোমাকে ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু তারপরও তুমি আমাকে কখনো ভুলে যাও নি! মূর্খতা হেতু বহুবার পাপ করে অপরাধী হয়েছি, কিন্তু তুমি চরম ধৈর্যসহ আমার উপর দয়া ও মেহেরবানী করে ঐ পাপসমূহ ঢেকে রেখেছো!"

এরপর লোকটি হঠাৎ অদৃশ্য হলেন। আমি অনেক অনুসন্ধান করেও আর তাঁকে খুঁজে পাই নি। তবে পরে জানতে পারি তিনি ছিলেন, হযরত আবু উবাইদ খাওয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। শোনা যায়, তিনি দীর্ঘ সত্তুর বৎসর আসমানের দিকে চোখ তুলে তাকান নি। এর কারণ জানতে চাইলে জবাব দিলেন, "মহান সেই দাতার সম্মুখে এই মলিন নাফরমান মুখ কি করে উপস্থিত করবো?" আল্লাহ পাক তাঁদের ওয়াসিলায় আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

৩. হযরত মালিক বিন দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৩১ হি.) বলেন: আমি পবিত্র হজ্জ পালনে রওয়ানা হলাম। পথে এক যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো। তিনি পায়দল যাচ্ছেন। তাঁর নিকট না ছিলো সওয়ারী আর না আছে খাদ্যদ্রব্য। আমি তাঁকে সালাম জানালাম। তিনি উত্তর দিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, হে যুবক! আপনি কোত্থেকে এসেছেন? জবাব দিলেন, "তাঁর নিকট থেকে"। জিজ্ঞেস করলাম, যাচ্ছেন কোথায়? জবাব দিলেন, "তাঁর নিকট"। আবার জিজ্ঞেস করলাম, রসদসামগ্রী কোথায়? তিনি জবাব দিলেন, "তাঁর জিম্মায়!"। বললাম সামান ব্যতীত চলে না, সাথে কি আছে বলুন? তিনি জবাব দিলেন, "আমি সফরের শুরুতে ৫টি হরফকে পাথেয় স্বরূপ সঙ্গে নিয়েছি। এই হরফগুলো হলো "كهيعص"। জিজ্ঞেস করলাম, "বুঝি নি, বুঝিয়ে বলুন?" তিনি বললেন, "কাফ হলো 'কাফী' অর্থাৎ যথেষ্ট। হা মানে হাদী। ইয়া অর্থ ঠিকানাদাতা। আ'ইন হলো

আলিম, সর্বজ্ঞান। আর ছোয়াদ অর্থ সাদিক। মনে রাখুন, তিনি যথেষ্ট হিদায়াতদাতা, ঠিকানাদাতা, সর্বজ্ঞানী, ওয়াদা খিলাফ করেন না। সেই জাত থাকতে আবার ভয় কিসের?" তাঁর কথা শ্রবণ করে নিজের কোর্তা দিতে ইচ্ছা করলাম। তিনি তা নিতে অস্বীকার করে বললেন, "বড় মিয়া! দুনিয়ার কোর্তার চেয়ে উলঙ্গ থাকা ভালো! হালাল বস্তুর হিসাব দিতে হবে আর হারাম বস্তুর জন্য আযাব ভোগ করা লাগবে।" রাত ঘনিয়ে আসলো। অন্ধকারের মধ্যে ঐ যুবক আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে যাতে পাক! ... আমাকে ঐ জিনিস দান করুন, যাতে আপনার কোন ক্ষতি নেই।"

এরপর লোকজন ইহরাম বেধে লাব্বায়িক পাঠ করতে লাগলো। কিন্তু ঐ যুবক লাব্বায়িক পাঠ করলেন না। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে জবাব দিলেন, "আমি ভয় করছি, এদিক থেকে আমি লাব্বায়িক বললে, না জানি সেদিক থেকে জবাব এসে যায়, লা-লাব্বায়িক!" এরপর পথে আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। হজ্জের সময় (১০ জিলহাজ্জ) মিনায় একদিন সাক্ষাৎ ঘটলো। তিনি তখন একটি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন, " ... আল্লাহর কসম! আমার রূহ যদি জানতো কার সাথে তার সম্পর্ক, তাহলে পায়ের বদলে মাথা দ্বারা দাঁড়াতো। ওহে তিরস্কারকারীর দল, যদি তোমরা দেখতে আমি যা দেখছি, তাহলে কখনও তিরস্কার করতে না। মানুষ শরীর দ্বারা তাওয়াফ করে, যদি তারা ঐ জাতের তাওয়াফ করতো তাহলে হারাম শরীফের প্রয়োজন পড়তো না। ঈদের দিন মানুষ ভেড়া-বকরি কুরবানী দিচ্ছে আর আমার মাশুক আমার জান কুরবানী করে ফেলেছেন। সুতরাং আমি কুরবান করছি আমার রক্ত ও প্রাণ!..."

হযরত মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এরপর দেখলাম তিনি এক হৃদয় নিংড়ানো দু'আ করলেন, "ওহে মা'বুদ! মানুষ তোমার নৈকট্যের আশায় কুরবানী করছে। আমার সে সামর্থ্য নেই। কাজেই নিজের জানকে তোমার দরবারে কুরবানীর জন্তু হিসাবে পেশ করছি। তুমি অনুগ্রহ করে কবুল করো।" এটুকু বলে তিনি এমন জোরে চিৎকার দিলেন যে, তাতেই তাঁর প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল! মাটিতে তার লাশ লুটে পড়লো। আমি শোনলাম, গায়েব থেকে আওয়াজ উঠেছে, "তিনি আল্লাহর দোস্ত! আল্লাহর জন্য কুরবান হয়েছেন।"

৪. হযরত আবু আবদুল্লাহ জওহারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ এক বৎসর আমি (হজ্জের দিন) আরাফাতের ময়দানে হাজির ছিলাম। এক সময় আমার তন্দ্রা এসে গেল। স্বপ্নে দেখি, আসমান থেকে দু'জন ফিরিশতা অবতরণ করেছেন। প্রথমজন দ্বিতীয় জনকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ বৎসর ক'জন হজ্জ পালনে এসেছেন?" দ্বিতীয়জন উত্তর দিলেন,

"ছয় লক্ষ। তবে মাত্র ছয় জনের হজ্জ কবুল হয়েছে!" একথা শোনে আমি হতবাক! মনে হলো নিজের গালে থাপ্পড় মারবো। কান্নাকাটি করতে লাগলাম। এরপর শোনলাম প্রথম ফিরিশতা আবার জিজ্ঞেস করছেন, "যাদের হজ্জ কবুল হয় নি, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা কিরূপ ব্যবহার করেছেন?" দ্বিতীয়জন জবাব দিলেন, "প্রেমময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমতের দৃষ্টিপাত করেছেন। ঐ ছয় জনের ওয়াসিলায় ছয় লক্ষ হজ্জযাত্রীর হজ্জই কবুল করে নিয়েছেন।" সুবহানাল্লাহ!

৫. হযরত আলী বিন মুয়াফ্‌ফিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: ষাট বার হজ্জ পালন করার পর বাইতুল্লাহ্‌ শরীফের কাছে বসে চিন্তা করতে লাগলাম, আলহামদুলিল্লাহ! অনেকবার আল্লাহ তা'আলা হজ্জযাত্রী হিসাবে কবুল করেছেন। আর কতকাল মাঠ-ঘাট ও দুষ্কর মরুপ্রান্তর অতিক্রম করবো। সুতরাং এবারই শেষ হজ্জ। এরপর আমার একটু ঘুম এসে গেল। গায়েব থেকে একটি আওয়াজ শ্রবণ করলাম, "হে ইবনে মুয়াফ্‌ফিক! ঐ ব্যক্তি বড় ভাগ্যবান যাকে এদিকে ডাকা হয়। তিনি যাকে পছন্দ করেন একমাত্র তাকেই আপন ঘরের মেহমান করেন।"

৬. হযরত যুননূন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: একদা বাইতুল্লাহ্‌ শরীফের নিকট এক যুবককে দেখতে পেলাম। সে একটার উপর আরেকটা সিজদা দিচ্ছিলো। বললাম, খুব বেশী নামায পড়ছ বুঝি? সে জবাব দিল, দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাচ্ছি। একটু পর দেখি উপর থেকে এক টুকরো কাগজ পতিত হলো। এতে লিখা ছিলো, "বড় ক্ষমাশীল ও ইজ্জতওয়ালা মনিবের পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি শোকরগুজার! তুমি দেশে ফিরে যাও এমন অবস্থায় যে, তোমার আগে-পেছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।"

৭. হযরত ইমাম মালিক ইবনে আনাস (৯৫-১৭৯ হি.) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: সৈয়দ বংশের মধ্যে ইমাম জয়নুল আবিদীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো মুত্তাকী ও পরহেজগার আমি আর কাউকে দেখি নি। এরপরও তিনি যখন হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন তখন তাঁর জবান দিয়ে লাব্বায়িক বের হচ্ছিলো না। চলার পথে যখনই লাব্বায়িক বলতে ইচ্ছা করতেন তখনই বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। এভাবে মক্কা মুয়াজ্জমা পর্যন্ত সারা পথ অতিবাহিত হলো। এক পর্যায়ে উটের পিঠ থেকে পড়ে যেয়ে হাড্ডি ভেঙ্গে যায়। তিনি এভাবে বেহুঁশ হওয়ার কারণ হিসাবে বলতেন, আমি লাব্বায়িক বললে, যদি উপর থেকে জবাব এসে যায় লা-লাব্বায়িক, তখন উপায়?

৮. হযরত শাকীক বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৯৪ হি.) বলেনঃ মক্কা শরীফ যাওয়ার পথে এক ল্যাংড়া ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি হেঁচড়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোত্থেকে এসেছেন? জবাব দিলেন, সমরকন্দ থেকে এসেছি। আবার জিজ্ঞেস করলাম, কতদিন পূর্বে যাত্রা করেছিলেন? জবাব দিলেন, দশ বৎসর পূর্বে! আমি বিস্ময়ে হতবাক! তিনি বললেন, "হে শাকীক! আপনি কি দেখছেন? আমার অন্তরের আবেগ সফরের দূরত্বকে নিকটবর্তী করে দিয়েছে। ওহে শাকীক! যে দুর্বলকে স্বয়ং তাঁর মালিক নিয়ে যাচ্ছেন তার উপর আপনি আশ্চর্যবোধ করছেন? বন্ধুর মিলন পর্যন্ত পৌঁছা যাক বা না, চেষ্টা তো করে যাবো।"

আশিকোঁ ছে কিয়া মজা হায়, মাশুকোঁ ছে পুছিও,
বাগে গুলমে কিয়া মজা হায় বুলবুলোঁ ছে পুছিও।

প্রেমের মাঝে কি আনন্দ প্রেমিকদেরকে জিজ্ঞেস করো,
ফুলবাগানে কি মজা বুলবুলিদের জিজ্ঞেস করো।

৯. জনৈক বুজুর্গ বলেনঃ আমি একবার মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত ছিলাম। মসজিদে নববীতে রওজা মুবারকের নিকট এক আজমী বুজুর্গকে দেখতে পেলাম। খুব আবেগ-আপ্লুত হয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে গমনের জন্য হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বিদায় হচ্ছেন। আমি তাঁর সঙ্গে হজ্জযাত্রী হাওয়ার ইচ্ছা করলাম। সুতরাং আমি তার পেছনে পেছনে যেতে লাগলাম। জুল-হুলাইফায় যেয়ে তিনি ইহরাম বাঁধলেন। আমিও বাঁধলাম। এরপর সাক্ষাৎ করে আমার মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, না! আমার সাথে যেতে পারবেন না। আমি অনুনয়-বিনয় করে তাঁকে রাজী করলাম। তিনি শর্ত দিলেন, যদি সবকিছু গোপন রাখতে পারো তাহলে যেতে পারবেন। আমি রাজী হলাম।

রাতের অন্ধকারে আমরা হাঁটতে লাগলাম লাব্বায়িক পাঠ করতে করতে। ভোরের আলোতে যখন পৃথিবীর জমিন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠলো, তখন আমি অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি আমরা মসজিদে তান'ঈমের নিকটে! এ স্থানটি মক্কা শরীফ থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আমার বুজুর্গ সাথী বললেন, এখন আমি চলে যাচ্ছি। সুতরাং তিনি চলে গেলেন আর আমি সেখানে বিশ্রাম শেষে মক্কা মুয়াজ্জমায় এসে উপস্থিত হলাম। তাওয়াফ শেষে হযরত শায়খ আবু বকর কাত্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খিদমাতে হাজির হলাম। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আরো কয়েকজন শায়খ। হযরত

আমাকে দেখে প্রশ্ন করলেন, আপনি মদীনা শরীফ থেকে কবে আসলেন? বললাম, গতরাতেই ওখানে ছিলাম। একথা শোনে সকলে একে অন্যের দিকে চাওয়া-চাওয়ি শুরু করলেন। আমি তখন ঐ বুজুর্গের কথা ব্যক্ত করলাম। হযরত কাত্তানী বললেন, "ওহ! আপনি হযরত আবু জাফর ওয়ামিগানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে এসেছেন। তাঁর বিভিন্ন কারামতের মধ্যে এটা একটি সাধারণ ব্যাপার!"

১০. হযরত সুফিয়ান ইবনে ইব্রাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: আমি মক্কা মুয়াজ্জমায় একদা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মস্থানের নিকট হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে (মৃ: ১৬১ হি.) দেখতে পেলাম। তিনি অশ্রুঝরা ক্রন্দনে রত। আমি কিছু নামাজ আদায় করে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত! এতো কাঁদছেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, "যদি কথাটি গোপন রাখতে পারো তাহলে বলি। আজ তিরিশ বৎসর চললো, আমার মন শেকবাজ (একপ্রকার সুস্বাদু খাবার) খেতে ইচ্ছাপোষণ করে আসছে। মুজাহাদার দ্বারা নফসকে এ থেকে বঞ্চিত রাখি। রাতে স্বপ্নে দেখলাম, খুব সুন্দর নূরানী চেহারাযুক্ত এক যুবক শেকবাজে পাত্রভর্তি উষ্ণ খাদ্য নিয়ে হাজির! আমি নিজেকে সংবরণ করে দিলাম। কিন্তু যুবক বললেন, হে ইব্রাহীম! এটা খাও। আমি বললাম, আল্লাহর জন্য ত্রিশ বৎসর যে জিনিস ভক্ষণ করা থেকে বিরত রয়েছি তা আমি আজ কিভাবে খাবো? তিনি বললেন, যদি স্বয়ং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এসে থাকে তবুও না? বললাম, তার নিশ্চয়তা কি? তিনি বললেন, বেহেশতের খাদিম রিজওয়ান ফিরিশতা আমাকে বললো, "আল্লাহ পাক বলেছেন, খিজিরকে গিয়ে বলো সে যেনো শেকবাজ নিয়ে আমার বান্দা ইব্রাহীমের নিকট যায় এবং তা তাকে খাওয়ায়।" আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এরূপ মাহাব্বাতের নিদর্শন প্রকাশ পেলে কি কারো চোখ শুকনো থাকতে পারে?"

১১. হযরত শায়খ আলী ইবনে মুয়াফ্‌ফিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: আমি একদা হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। পথিমধ্যে একদল লোক পেলাম যারা পদব্রজে যাচ্ছিলেন। আমারও ইচ্ছা হলো তাদের সাথে শরীক হতে। এক জায়গায় গিয়ে রাত্রিযাপন করছিলাম। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে দেখি একদল হুরসদৃশ সুন্দরী যুবতী এসে যাত্রীদের সকলের পা জাফরান-মিশ্রিত পানি দ্বারা ধৌত করে দিচ্ছে। আমার পাশে একটি মেয়ে আসার পর অপর আরেকজন বললো, এ লোকটি তো পদব্রজে হজ্জপালনকারী নয়! কিন্তু সে বললো, হ্যাঁ, তিনিও পদব্রজে যাত্রা করেছেন। সওয়ারী ছেড়ে এদের সঙ্গী

হয়েছেন। সুতরাং মেয়েটি আমার পা-ও ধুঁয়ে দিল। পরদিন হাটতে যেয়ে লক্ষ্য করলাম, সকলের ক্লান্তিবোধ ও পায়ের ব্যথা দূর হয়ে গেছে। (ফাজায়েলে হজ্জ)

১২. হযরত আলী ইবনে মুয়াফ্‌ফিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ আমি বেশ কয়েকবার হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে হজ্জ পালন করেছি। আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রশ্ন করছেন, হে ইবনে মুয়াফ্‌ফিক! তুমি কি আমার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করছো? জবাব দিলাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবার প্রশ্ন করলেন, তুমি আমার পক্ষ থেকে লাব্বায়িক বলছো? বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, “এর প্রতিদান আমি রোজ কিয়ামতে দেবো। সেদিনকার হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে মানুষ যখন অস্থির থাকবে তখন আমি নিজের হাতে তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবো।”

১৩. ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৫০৫ হি.) বর্ণনা করেনঃ প্রত্যহ মাগরিবের সময় অবশ্যই একজন আবদাল এবং ভোরে একজন আওতাদ খানায়ে কা’বার তাওয়াফ করেন। এভাবে তাওয়াফ জারি না থাকলে দুনিয়ার মাটি থেকে বাইতুল্লাহ্‌ শরীফ উঠিয়ে নেওয়া হবে। একদিন মানুষ ভোরে জেগে উঠবে, দেখবে কা’বা শরীফ নেই! এটা ঠিক তখন হবে যখন দীর্ঘ ৭ বৎসর পার হয়ে যাবে অথচ ইতোমধ্যে তাওয়াফ করার কেউ থাকবে না।

পরিচ্ছেদ ৩

আহকামে হজ্জ ও উমরাহ

হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত

কার উপর হজ্জ ফরয তা শরীয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এসব শর্ত হলোঃ **১. মুসলমান হওয়া। ২. বালিগ হওয়া। ৩. হজ্জের সফরের জন্য আর্থিক সঙ্গতি থাকা। ৪. সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া। ৫. শারীরিকভাবে সক্ষম থাকা। ৬. যাতায়াতের রাস্তা নিরাপদ থাকা। ৭. মহিলাদের সঙ্গে নিজের স্বামী অথবা মাহরাম কোন পুরুষ থাকা।** যাদের সঙ্গে মহিলার বিবাহ হারাম তাকে মাহরাম বলে। যথাঃ আপন বাবা, দাদা, নানা, চাচা, ভাই, দুধভাই, শ্বশুর, পুত্র, ভাইপুত্র, বোনপুত্র, মামা, মেয়ের জামাই এবং নাতি।

এ ব্যাপারে আরো কিছু জানার ইচ্ছা থাকলে বিজ্ঞ আলিমের নিকট থেকে জেনে নিন।

হজ্জ তিন প্রকার

হজ্জ পালনকারী তিন ধরনের হজ্জের মধ্যে যে কোন একটি অবশ্য পালন করবেন। এগুলো হলোঃ **১. ইফরাদ, ২. তামাত্তু ও ৩. ক্বিরান।**

১. হজ্জে ইফরাদঃ মীক্বাত বা এর সীমানার বাইর থেকে হজ্জের মৌসুমে একমাত্র হজ্জের জন্য ইহরামের নিয়ত করাকে হজ্জে ইফরাদ বলে। কাপড় পরিধানসহ ইহরামের সকল নিয়ম মেনে ১০ই জিলহাজ্জ জামারাতে আক্বাবায় (বড় শয়তানকে) কঙ্কর নিক্ষেপ করে মাথা মুণ্ডানো পর্যন্ত থাকতে হবে। হজ্জে ইফরাদকারীর জন্য কুরবানী (দমে শুকুর) করা ওয়াজিব নয়।

২. হজ্জে তামাত্তুঃ হজ্জের মৌসুমে মীক্বাত বা এর সীমানার বাইর থেকে প্রথমে উমরার জন্য ইহরামের নিয়ত করে, মক্কা শরীফ যেয়ে তা পালন করে মাথা মুণ্ডিয়ে ইহরাম ছেড়ে হালাল হতে হয়। এরপর ৮ জিলহাজ্জ মিনায় যাওয়ার পূর্বে পুনরায় হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধতে হবে। ১০ জিলহাজ্জ জামারাতে আক্বাবায় (বড় শয়তানকে) কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানী (দমে শুকুর) ও মাথা মুণ্ডিয়ে ইহরাম ছেড়ে হালাল হবেন। তামাত্তু পালনকারীর জন্য দমে শুকুর আদায় করা ওয়াজিব।

৩. হজ্জে ক্বিরান: মীক্বাত বা এর সীমানার বাইর থেকে একই সাথে উমরা ও হজ্জের নিয়তে ইহরামের কাপড় পরতে হয়। প্রথমে মক্কা শরীফ পৌঁছে উমরা পালন শেষে মাথামুণ্ডন না করেই ইহরামের অবস্থায় থাকতে হবে। ১০ জিলহাজ্জ জামারাতে আক্বাবায় (বড় শয়তানকে) কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে কুরবানী (দমে শুকুর) ও মাথা মুণ্ডানোর পর ইহরাম ছেড়ে হালাল হবেন। ক্বিরান পালনকারীর জন্য দমে শুকুর (কুরবানী) আদায় করা ওয়াজিব।

হজ্জের ফরয তিনটি

১. ইহরাম বাঁধা: পাক-পবিত্র অবস্থায় ইহরামের কাপড় পরে দু' রাকআ'ত নামায আদায় (ইফরাদকারীদের জন্য) শেষে হজ্জের নিয়তে তালবিয়াহ্ (লাব্বায়িক) পাঠ করা। তামাত্তুকারী উমরার নিয়ত করবেন। আর ক্বিরানকারী নিয়ত করবেন উমরা এবং হজ্জের একই সঙ্গে। নীচে ইহরাম সম্পর্কে আরো কিছু **জরুরী মাসআলা** তুলে ধরা হলো।

ইহরামের ওয়াজিব: ১. মীক্বাত বা এর বাইরে ইহরামের নিয়ত করা। ২. অন্তত **১** বার তালবিয়াহ্ পাঠ করা (পুরুষরা উচ্চস্বরে ও মহিলারা নিম্নস্বরে পাঠ করবেন)। ৩. ইহরাম অবস্থায় যেসব জিনিষ নিষিদ্ধ তা বর্জন করা।

ইহরামের সুন্নাত: ১. হজ্জের মাসে হজ্জের ইহরাম বাধা। ২. যারতার মীক্বাতে ইহরাম বাধা। ৩. ইহরাম বাধার নিয়তে গোসল করা। ৪. পুরুষদের জন্য দু' টুকরো সেলাইহীন কাপড় পরিধান করা। ৫. দু'রাকআ'ত নফল নামায পড়া। ৭. তালবিয়াহ্ তিনবার পাঠ করা (পুরুষরা উচ্চস্বরে এবং মহিলারা অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্বরে)। ৮. ইহরামের নিয়তের পূর্বে আতর ব্যবহার।

ইহরামের মুস্তাহাব: ১. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া। ২. নখ কাটা। ৩. বগলের লোম উপড়ে ফেলা। ৪. নাভির নীচের লোম সাফ করা। ৫. ইহরামের জন্য সাদা কাপড় ব্যবহার করা। ৬. পুরুষের জন্য চপ্পল ব্যবহার করা। ৭. নামায শেষে মুসাল্লায় বসে ইহরামের নিয়ত করা ও তালবিয়াহ্ পাঠ করা। ৮. মীক্বাতে যাওয়ার পূর্বেই ইহরাম বাধা।

ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ নিষিদ্ধ: ১. স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্ক, এমনকি এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করাও নিষিদ্ধ। ২. পুরুষের জন্য মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা নিষিদ্ধ। জাগ্রত-নিদ্রিত সর্বাবস্থায় মাথা ও মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রাখতে হবে। ৩. যে কোন সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ। যেমন আতর, গন্ধযুক্ত সাবান, সুগন্ধি তৈল ও ক্রীম ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না। ৪. সব ধরনের ক্ষৌরকার্য নিষিদ্ধ। চুল, দাড়ি, গোফ, বগল ও

নাভির নীচের লোম ইত্যাদি উপড়ানো, কাটা, ছাঁটা কিংবা শেভ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকি হাত-পায়ের নখও কাটতে পারবেন না। ৫. বন্য পশু-পাখি শিকার বা কাউকে শিকার করতে সাহায্য-সহযোগিতা নিষিদ্ধ। (**দ্রঃ** আজকাল ইহরাম অবস্থায় এরূপ কাজ করার সুযোগ নেই বললেই চলে- তথাপি ব্যাপারটা অবগত হওয়া বাঞ্ছনীয়।) ৬. ইহরাম অবস্থায় পুরুষের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান নিষিদ্ধ। পুরুষের জন্য এমন জুতাও পরা নিষেধ যা পায়ের পাতার উপরের মধ্যবর্তী হাড্ডি ঢেকে ফেলে। সুতরাং সর্বদা চপ্পল ব্যবহার করবেন। মহিলারা সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করবেন এবং যে কোন ধরনের জুতাও পরতে পারবেন। ৭. ঝগড়া-বিবাদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সফর অবস্থায় ধৈর্য ধারণ একান্ত জরুরী। ঝগড়া-ফাসাদ এমনিতেই পাপের কাজ, ইহরাম অবস্থায় আরো কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

২. উকুফে আরাফাহঃ ৯ জিলহাজ্জ দুপুরে সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে ১০ জিলহাজ্জ সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন এক সময় আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। নীচে হজ্জের এই গুরুত্বপূর্ণ ফরয সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হলো।

উকুফে আরাফার ওয়াজিবঃ ১. মুসলমান হওয়া। ২. (হজ্জযাত্রীকে) ইহরাম অবস্থায় থাকা। ৩. আরাফাতের সীমানার ভেতর অবস্থান করা। ৪. সঠিক সময়ে থাকা। ৯ জিলহাজ্জ জাওয়াল (দুপুরে সূর্য পশ্চিমাকাশে কিছু হেলিয়ে পড়ার) সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত থাকা ওয়াজিব। এ সময়ের ভেতর আরাফাতের সীমানা থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ।

উকুফে আরাফার সুন্নাতঃ ১. উকুফের নিয়তে গোসল করা। ২. (মসজিদের) ইমামের জন্য জাওয়াল পরে যুহর-আসর নামাযের আগে দু'টি খুতবা প্রদান। ৩. যুহরের নামায আদায় করেই উকুফ শুরু করা।

উকুফে আরাফার মুস্তাহাবঃ ১. তালবিয়াহ্‌ (লাব্বায়িক) বেশি করে পাঠ করা। ২. তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাহলিল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ইস্তিগফার, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, দুয়া-দরূদ বেশি বেশি করা। ৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে স্থানে দাঁড়িয়ে উকুফ করেছেন সেখানে উকুফ করা (আজকাল অনেকের জন্য তা সম্ভব হয় না)। ৪. সর্বদা বিনয় অবলম্বন। ৫. দাঁড়ানো অবস্থায় কিবলামুখী থাকা। ৬. জাওয়াল শুরুর পূর্ব থেকেই উকুফের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ। ৭. উকুফ পালনের জন্য (মনে মনে) নিয়ত করা। ৮. দু'আর সময় হাত উপরের দিকে উত্তোলন। ৯. উপযুক্ত কারণ না থাকলে

রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়ানো। ১০. যত সম্ভব সাদকা-খয়রাত ও একে-অন্যে সাহায্য সহযোগিতা করা।

৩. তাওয়াফে জিয়ারত: ১০ জিলহাজ্জ ভোর থেকে ১২ জিলহাজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই তাওয়াফ অবশ্যই পালন করতে হবে।

দ্র: এই তিন ফরযের মধ্যে প্রথমটি **শর্ত** ও শেষোক্ত দু'টি **রুকন**।

নীচে তাওয়াফ সম্পর্কিত বিস্তাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হলো।

তাওয়াফের ধরন, ওয়াজিব ও সুন্নাত

তাওয়াফের ধরন: তাওয়াফ মোট ৭ প্রকার। ১. তাওয়াফে কুদুম। ২. তাওয়াফে জিয়ারত। ৩. তাওয়াফে সদর বা বিদা। ৪. তাওয়াফে উমরা। ৫. তাওয়াফে নযর। ৬. তাওয়াফে তাহিয়্যাতুল মসজিদ। ৭. তাওয়াফে নফল।

প্রত্যেক তাওয়াফকালে নিম্নোক্ত ওয়াজিবগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে।

দ্র: উক্ত প্রথম তিনটি তাওয়াফ হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত। বাকী ৪টি সুন্নাত, নফল বা মুস্তাহাব পর্যায়ের।

তাওয়াফের ওয়াজিব: ১. নিয়ত: তাওয়াফের জন্য মনে মনে হলেও নিয়ত করা। **২. অযু তথা পাক অবস্থায় থাকা:** মহিলাদের জন্য হায়েজ-নিফাস অবস্থায় তাওয়াফ জায়িয নয়। ফরয গোসলের প্রয়োজন হলে তা অবশ্যই করতে হবে। **৩. সতর ঢাকা:** ইহরামের বা সাধারণ কাপড় পরাবস্থায় সর্বদা সতর ঢাকা থাকতে হবে। **৪. পায়ে হাঁটা:** মাজুর না হলে পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করতে হবে। **৫. রুকনে হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু ও শেষ:** তাওয়াফ রুকনে হাজারে আসওয়াদ (অর্থাৎ এই কোণের রেখা) থেকে ডানদিকে চলে শুরু হবে। বর্তমানে এই কোণ বরাবর মসজিদের দু'তলায় একটি সবুজ বাতি আছে যা দেখে রেখা নির্ণয় সম্ভব হয়। প্রতি চক্কর এই রেখায় এসে শেষও হবে। সপ্তম চক্কর এই রেখা পার হয়ে গেলেই শেষ হয়ে যাবে। (**দ্র:** বর্তমানে এই রেখাটি তুলে দেওয়া হয়েছে।) **৬. হাতীমের বাইরে থাকা:** তাওয়াফকালে অবশ্যই হাতীমের বাইরে সর্বদা থাকতে হবে। এর মূল কারণ হলো, হাতীম আসলে কাবা শরীফের অভ্যন্তরস্থ অংশবিশেষ। **৭. সাত চক্কর:** পূর্ণ সাত চক্কর তাওয়াফ করতে হবে। **৮. ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায:** সাত চক্কর শেষে দু' রাকাআত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায আদায় করা। মাকরুহ ওয়াক্ত হলে পরে আদায় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

-"আর তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও।" (সূরা বাক্বারা : ১২৫)

তাওয়াফের সুন্নাত: ১. সম্ভব হলে হাজারে আসওয়াদে চুমো খাওয়া। ২. যেসব তাওয়াফের পরে সাঈ আছে ইজতিবাসহ রমল করা। ৩. সাঈতে যাওয়ার পূর্বে সম্ভব হলে হাজারে আসওয়াদে চুমো খাওয়া। ৪. তাওয়াফ শুরুর সময় তাকবীরে তাহরীমার মতো দু' হাত কান পর্যন্ত উঠানো। ৫. তাওয়াফ আরম্ভের সময় হাজারে আসওয়াদের দিকে মুখ করা। ৬. না থেমে একাধারে সাত চক্কর দেওয়া। ৭. কাপড় (বা ইহরামের কাপড়) পাক-পবিত্র হওয়া।

হজ্জের ওয়াজিব

১. সাঈ: সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে ৭ বার দৌড় দেওয়া। **২. উকুফে মুজদালিফা:** ৯ জিলহাজ্জ দিবাগত রাত সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত মুজদালিফার ময়দানে অবস্থান। **৩. রামি:** মিনায় স্থাপিত জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা। ১০ জিলহাজ্জ শুধুমাত্র জামারাতে আক্বাবায় (বড় শয়তানকে) ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। নিক্ষেপের সময় হলো ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। এরপর ১১ ও ১২ জিলহাজ্জ দুপুরে সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে কোন সময় তিনটি স্থানে (জামারাতে ছোগরা, উসতা ও কুবরায়) ৭টি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। জেনে রাখা ভালো, ১২ জিলহাজ্জ কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে মাগরিবের পূর্বে মিনার সীমানা ছেড়ে চলে যেতে পারলে ১৩ জিলহাজ্জ কঙ্কর মারার প্রয়োজন হবে না। তবে এই শর্ত স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় পালন করতে ব্যর্থ হলে মিনায় থেকে ১৩ তারিখও তিন স্থানে কঙ্কর নিক্ষেপ ওয়াজিব হবে। **৪. কুরবানী (দমে শুকুর):** হজ্জে ক্বিরান ও তামাত্তু পালনকারীর জন্য দমে শুকুর বা কুরবানী আইয়্যামে নহরের ভেতর করা। **৫. হলক:** কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে কুরবানী থাকলে তা আদায় করে মাথা মুণ্ডানো। **৬. তাওয়াফে বিদা:** বহিরাগত হজ্জযাত্রীদের জন্য তাওয়াফে বিদা পালন করা। এই তাওয়াফে ইজতিবাহ, রমল এবং সাঈ নেই।

এবার একে একে এসব ওয়াজিব পালনের নিয়ম-কানুন তুলে ধরছি।

সাঈর ওয়াজিব: ১. তাওয়াফের পরে সাঈ করা (অর্থাৎ সাঈ তাওয়াফের সাথে সম্পৃক্ত)। ২. সাফা পাহাড়ে শুরু করে মারওয়ায় শেষ করা। ৩. মাজুর না হলে পায়ে

হেঁটে সাঈ করা। ৪. পূর্ণ ৭ দৌড় পালন করা (**দ্রঃ** সাফা থেকে মারওয়া এক দৌড় এবং মারওয়া থেকে সাফা আরেক দৌড়)। ৫. উমরার সাঈ হলে ইহরাম অবস্থায় থাকা। ৬. উভয় পাহাড়ে আরোহণসহ প্রত্যেক দৌড়ে পূর্ণ দূরত্ব পর্যন্ত ভ্রমণ করা (**দ্রঃ** বর্তমানে সাফা ও মারওয়াহ পাহাড়ের চিহ্ন শুধু বিদ্যমান আছে। এরপরও যতদূর সম্ভব উপরে আরোহণ করা জরুরী)।

দ্রঃ সাঈ শুধুমাত্র তাওয়াফ শেষে করা হয়। একমাত্র 'তাওয়াফে জিয়ারত' শেষে 'হজ্জের ওয়াজিব সাঈ' সাধারণ কাপড় পরে হতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রে ইহরাম অবস্থায় সাঈ হবে। যেমনঃ (ক) ইহরাম পরে নফল তাওয়াফের সাথে সাঈ। এই সাঈ মিনায় যাওয়ার পূর্বে তামাত্তু হজ্জ পালনকারীরা করে থাকেন। এটা হজ্জের ওয়াজিব সাঈ পূর্বেই শেষ করে যাওয়ার একটি উপায়। (খ) ইহরাম অবস্থায় ক্বিরান ও ইফরাদ পালনকারী হজ্জযাত্রী তাওয়াফে কুদুমের পরে সাঈ পালন করতে পারেন। এটাও হজ্জের ওয়াজিব সাঈ হিসাবে গণ্য হবে। (গ) ইহরাম অবস্থায় উমরার তাওয়াফ শেষে সাঈ।

সুতরাং জেনে রাখা প্রয়োজন, ইহরামহীন 'নফল' বা 'মুস্তাহাব' কোন সাঈ নেই।

সাঈর সুন্নাতঃ ১. শুরুর পূর্বে ইসতিলামঃ সাঈর পূর্বে 'ইসতিলাম' করা। হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করা হলো ইসতিলাম। তবে আজকাল এ সুন্নাত পালন খুব কঠিন। বিধায় ইশারায় 'ইসতিলাম' করতে হয়। **২. তাওয়াফের পরই শুরুঃ** তাওয়াফের পরই ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায ও (সম্ভব হলে) ইসতিলাম করে সাঈ পালন করা। **৩. উভয় পাহাড়ে আরোহণঃ** সাঈর সময় প্রত্যেক দৌড়ে সাফা ও মারওয়াহ পাহাড়ের উপর আরোহণ (**দ্রঃ** আজকাল সামান্য উপরে আরোহণ করতে হয়)। **৪. পাহাড়ে উঠে কিবলামুখী হওয়াঃ** সাফা ও মারওয়ায় আরোহণ করে কিবলামুখী হওয়া। **৫. একই সঙ্গে সাত দৌড় পালনঃ** সাত দৌড় একের পর এক শেষ করা। **৬. পাক-পবিত্র থাকাঃ** জানাবাত ও হায়েজ নিফাস থেকে মুক্ত থাকা এবং অযু অবস্থায় থাকা। **৭. মৃদু দৌড়ঃ** সবুজ বাতি দ্বারা চিহ্নিত স্থানে পুরুষরা কিছুটা দৌড়ে চলা। **৮. সতর ঢাকাঃ** সতর সর্বদাই ঢাকা থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে তা আরো গুরুত্ববহ।

সাঈর মুস্তাহাবঃ ১. নিয়তঃ নিয়ত মনে মনে করলেও চলবে। **২. পাহাড়দ্বয়ে অপেক্ষাঃ** দৌড়ের সময় সাফা ও মারওয়ায় আরোহণ করে কিছুক্ষণ দু'আ-দরূদ-ইস্তিগ্‌ফার করা। **৩. জিকির ইস্তিগ্‌ফারঃ** সাঈর সময় খুব বিনয়ের সাথে তিন তিনবার করে জিকির-ইস্তিগ্‌ফার-দরূদ ইত্যাদি পাঠ করতে থাকা। **৪. নামায পালনঃ** মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে সাঈ শেষে দু' রাকআ'ত নফল নামায আদায় করা।

দ্রঃ মারওয়াহ পাহাড়ের উপর নফল নামায পড়া মাকরুহ। সাঈর দৌড়ের সময় ফরয নামায শুরু হলে নামাযে শরীক হতে হবে। এরপর সেখান থেকেই পুনরায় সাঈর কাজ অব্যাহত রাখতে হয়। অনুরূপ অন্য কোন জরুরত হলে তা শেষ করে পুনরায় সেখান থেকে সাঈর দৌড় অব্যাহত রাখবেন।

উকুফে মুজদালিফার ওয়াজিব: ১. মাগরিব ও ইশার নামায: মুজদালিফায় এসে মাগরিব ও ইশার নামায একই সাথে আদায় করা। **২. নির্ধারিত সময়ে 'উকুফ':** মুজদালিফায় উকুফের নির্ধারিত সময় হলো, সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। ওয়াজিব আদায়ের জন্য এই সময়ের মধ্যে অন্তত কিছুক্ষণ উপস্থিত থাকতে হবে (**দ্রঃ** মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত মুজদালিফার মাঠে উপস্থিত থাকা সুন্নাতে মুআক্কাদা)। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

-"অতঃপর যখন (তাওয়াফের জন্য) ফিরে আসবে আরাফাত থেকে, তখন মাশআ'রিল হারামের নিকটে আল্লাহকে স্মরণ কর।" (সূরা বাক্বারা : ১৯৮)

উকুফে মুজদালিফার সুন্নাত ও মুস্তাহাব: ১. রাত্রি জাগরণ: সারারাত জেগে নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ও দু'আ করা। **২. গোসল:** সুবহে সাদিকের পরে উকুফের জন্য (সম্ভব হলে) গোসল করা। **৩. কঙ্কর সংগ্রহ:** রামির জন্য সত্তুরটি (ছানার মতো) ছোট্ট কঙ্কর সংগ্রহ করা। **৪. কঙ্কর ধৌতকরণ:** রামির পূর্বে কঙ্কর ধৌত করা।

রামির মুস্তাহাব নিয়ম: ১. ১০ জিলহাজ্জ (বড় শয়তানকে) কঙ্কর নিক্ষেপের উত্তম সময় হলো সূর্যোদয় থেকে জাওয়াল পর্যন্ত। মুবাহ সময় হলো জাওয়াল থেকে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত। রাতে কঙ্কর নিক্ষেপ মাকরুহ। ২. জিলহাজ্জ মাসের **১১, ১২** ও **১৩** তারিখ (**দ্রঃ** যদি **১২** তারিখ রাতে মিনায় থাকা পড়ে, তাহলে **১৩** তারিখ কঙ্কর নিক্ষেপ ওয়াজিব) তিন শয়তানকে ছোট, মধ্যম ও বড়- এই তরতীবে কঙ্কর নিক্ষেপের উত্তম সময় হলো বাদ-যুহর থেকে মাগরিব পর্যন্ত। মাগরিব পরে কঙ্কর নিক্ষেপ মাকরুহ (**দ্রঃ** দুর্বল, মাজুর, বয়স্ক ব্যক্তি ও মহিলাদের জন্য রাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা যাবে)। **১৩** জিলহাজ্জ মাগরিব ওয়াক্তে রামির সময় শেষ হয়ে যায়। ছোট ও মধ্যম জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে দু'আ করা যাবে কিন্তু বড় শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ করে আর দু'আ করতে নেই। ৩. রামির সময় মিনার মাঠ ডানে এবং ক্বিবলা থাকবে বামদিকে। ৩. নিক্ষেপের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি ও

শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা কঙ্কর ধরা। ৪. ডান হাতে রামি করা। ৫. রামি শেষে অপেক্ষা না করে গন্তব্যস্থানে চলে যাওয়া।

দ্রঃ ১০ জিলহাজ্জ বড় শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপের পর তালবিয়াহ্‌ (লাব্বায়িক) পাঠ বন্ধ হয়ে যাবে।

কুরবানীর নিয়মকানুনঃ ১. ক্বিরান ও তামাত্তু হজ্জপালনকারীর জন্য রামি-কুরবানী-মাথা মুণ্ডানো, এই তরতীবে আদায় করে ইহরাম ছাড়া তথা হালাল হওয়া ওয়াজিব। ২. এই কুরবানীকে বলে 'দমে শুকুর'। তবে ঈদুল আযহার কুরবানীর মতোই দমে শুকুর আদায়ের যাবতীয় নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়। ৩. **'মুসাফির হিসাবে গণ্য'** হজ্জযাত্রীর জন্য ঈদুল আযহার 'কুরবানী' ওয়াজিব নয়। ৪. আইয়্যামে নহরের (তথা ১০, ১১ ও ১২ জিলহাজ্জের মধ্যে) দমে শুকুর অবশ্যই আদায় করতে হবে। ৫. যেহেতু দমে শুকুর আদায় ছাড়া মাথা মুণ্ডানো যাবে না- তাই ১২ জিলহাজ্জ কুরবানী করলে তখন পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকতে হবে।

মাথা মুণ্ডানোর নিয়মকানুনঃ ১. ক্বিরান ও তামাত্তু পালনকারীর জন্য রামি ও কুরবানীর পর মাথা মুণ্ডানো ওয়াজিব। ১. মাথা সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডানো সুন্নাত এবং আফজল। ছাঁটার মাধ্যমে শুধুমাত্র ওয়াজিব আদায় হবে। ২. মাথা মুণ্ডানোর সময় কিবলামুখী হয়ে বসা উত্তম। ৩. মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডানো জায়িয নয়- তারা সমস্ত মাথার চুল এক আঙ্গুল পরিমাণ কেটে ফেলবেন। ৩. আইয়্যামে নহর তথা ১০, ১১ ও ১২ জিলহাজ্জের মধ্যে মাথা মুণ্ডাতে হবে। ৪. হারাম শরীফের সীমানার মধ্যে মাথা মুণ্ডাতে হবে। ৫. চুল মাটির নীচে পুতে রাখা উত্তম। ৬. মাথা মুণ্ডিয়ে বা ছেঁটে হালাল হওয়ার পর তাওয়াফে জিয়ারতের পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ। তবে ইহরামের অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা অবশিষ্ট থাকবে না।

হজ্জের সুন্নাত

উপরোক্ত ফরয ও ওয়াজিব আমল ছাড়াও হজ্জযাত্রীদের জন্য বেশ কয়েকটি সুন্নাত পালন করতে হয়। এই সুন্নাতগুলোর একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. ইহরাম পরার নিয়তে গোসল করাঃ যদি সম্ভব হয় ইহরাম তথা নিয়তের পূর্বে গোসল সেরে সুগন্ধি ব্যবহার করবেন। **২. তাওয়াফে কুদুমঃ** আফাকী (মীক্বাতের বাইরে

বসবাসকারী) ইফরাদ বা ক্বিরান হজ্জযাত্রীর জন্য মক্কা শরীফ পৌঁছে এই তাওয়াফ করতে হয়। **৩. রমল:** তাওয়াফের পর সাঈ থাকলে ইজতিবাসহ রমল পালন। (প্রথম তিন চক্কর বীরের মতো হেলে দুলে একটু দ্রুত হাটা।) জানা থাকা ভালো, রমল প্রথম তিন চক্কর পর্যন্ত করতে হয় কিন্তু ইজতিবা পুরো সাত চক্কর পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। তাওয়াফে কুদুমের সময় সাঈ আদায় করে নিলে হজ্জের ওয়াজিব সাঈ সম্পাদন হয়ে যাবে। পরে আর করার প্রয়োজন পড়বে না। তবে তা তাওয়াফে জিয়ারতের সাথে করাই আফজল। **৪. ইমামের জন্য তিন জায়গায় খুতবা প্রদান:** ৭ জিলহাজ্জ মক্কা শরীফের মসজিদুল হারামে, ৯ জিলহাজ্জ আরাফাতে (মসজিদে নামিরায়) ও ১১ জিলহাজ্জ মিনায়। **৫. মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়:** ৮ জিলহাজ্জ মিনায় পৌঁছে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও (রাত্রি যাপন শেষে ৯ জিলহাজ্জ) ফযরের নামায আদায় করা। (**দ্রঃ** লক্ষ লক্ষ হজ্জযাত্রীদের যাতায়াত নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আজকাল কর্তৃপক্ষ ৭ জিলহাজ্জ রাত ১২টা থেকে বাস ছাড়ার ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং ৮ জিলহাজ্জ মক্কা শরীফে ফযরের নামায আদায় হয়তো সম্ভব হবে না। এছাড়া যানজট ও অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে মিনায় এই ৫ ওয়াক্ত নামায আদায় করা হয়তো সম্ভব না-ও হতে পারে। এ ব্যাপারে হজ্জযাত্রীদের ধৈর্যধারণ করা উচিৎ।) **৬. আরাফাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা:** সূর্যোদয়ের পর ৯ জিলহাজ্জ আরাফাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা। **৭. আরাফাতে গোসল:** আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের নিয়তে যুহরের পূর্বে গোসল করা। **৮. মুজদালিফার উদ্দেশ্যে যাত্রা:** বাদ মাগরিব (নামায আদায় না করে) আরাফাত থেকে মুজদালিফার উদ্দেশ্যে যাত্রা। **৯. মুজদালিফায় রাত্রি যাপন:** ৯ জিলহাজ্জ দিবাগত রাত মুজদালিফায় কাটানো। **১০. দিনরাত মিনায় অবস্থান:** জিলহাজ্জের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ দিবাগত রাত মিনায় থাকা। **১১. মুহাসসাফে বিশ্রাম:** মিনা থেকে মক্কা শরীফ প্রত্যাবর্তনের সময় (সম্ভব হলে) মুহাসসাফ নামক স্থানে কিছু সময় বিশ্রাম (এই স্থানটি কোথায় তা আজকাল জানা যায় না)।

বদলী হজ্জ

আমরা ইতোমধ্যে পবিত্র হজ্জ পালনের শরঈ আহকামের উপর বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছি। এবার বদলী হজ্জ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত কিছু কথা এ প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করা জরুরী মনে করছি। নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো বদলী হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

যে ব্যক্তি বদলী হজ্জ পালন করানোর উদ্দেশ্যে অপর কাউকে হজ্জে পাঠাবেন তাকে বলে **'আমির' (নির্দেশকারী)**। আর যে ব্যক্তি আমিরের নির্দেশে হজ্জে গমন করে বদলী হজ্জ পালন করবেন তিনি হচ্ছেন **'মামুর' (নির্দেশ পালনকারী)**।

বদলী হাজ্জ দু' ধরনের: ১. যে কোন ব্যক্তি নফল হজ্জ অপর কোন মৃত বা জীবিত ব্যক্তির নামে সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে পালন করতে পারেন। ঠিক যেভাবে নফল রোযা, নামায, সাদক্বা ইত্যাদি করা যায়। ২. মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত হেতু তার ওয়ারিসদের কর্তৃক ফরয বদলী হজ্জ করানো। অথবা জীবিত কোন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয থাকাবস্থায় কোন বিশেষ কারণ হেতু অপরকে দিয়ে তা করানো।

বদলী হজ্জ বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোল্লিখিত বিষয়গুলো প্রযোজ্য হবে:

১. যার উপর হজ্জ ফরয, তিনি যদি জীবিত থাকেন এবং হজ্জে গমনে শরীয়তসম্মত কোন বাঁধা না থাকে তাহলে বদলী হজ্জ করানো বৈধ নয়। তাকে নিজেই হজ্জে গমন করে ফরয আদায় করতে হবে।

২. নফল হজ্জ অপরকে দিয়ে করানো বৈধ। আমির নিজে তা পালন করতে সক্ষম থাকুক বা না থাকুক।

৩. যদি কোন সময় কারোর উপর হজ্জ ফরয হয়ে থাকে এবং অলসতা কিংবা উপেক্ষা হেতু সে তা পালন করে না এবং পরে সে হজ্জে গমনে অক্ষম হয়ে যায় তাহলে, তার জন্য জীবিত থাকাবস্থায় অপর কাউকে দিয়ে বদলী হজ্জ করানো ফরয। আর যদি না করে, তাহলে মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব। যদি কারোর উপর হজ্জ ফরয হওয়ার পর মক্কা শরীফ গিয়ে তা পালন করার কোন সুযোগই না থাকে অথবা (হজ্জ ফরয থাকাবস্থায়) সে সফরের অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তার জন্য ওসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব নয়। তবে এই শর্ত শুধুমাত্র প্রথম বৎসর হজ্জ ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সে যদি দ্বিতীয় বৎসরে মারা যায় তাহলে ওসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব হবে।

৪. যেসব কারণে কোন এক ব্যক্তি ফরয থাকা সত্ত্বেও হজ্জ পালনে অপারগ বলে বিবেচিত তাহলো মৃত্যু, কারাদণ্ড, এমন রোগ যা থেকে আরোগ্য লাভের আশা খুব ক্ষীণ এবং এ কারণে সে ভ্রমণে যেতে সম্পূর্ণ অপারগ, হজ্জে গমনের রাস্তা তার জন্য নিরাপদ নয়, দেশের শাসনকর্তা কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা কিংবা কোন মহিলা যার সাথী হিসাবে মাহরাম নেই। এসব কারণে হজ্জে গমনের অসুবিধা শরীয়তসম্মত ওজর হিসাবে গণ্য।

বদলী হজ্জের শর্তসমূহ

বদলী হজ্জের বৈধতার উপর উপরোক্ত পাঁচটি বিষয় ছাড়াও নিম্নে উল্লেখিত শর্তগুলো এতে জড়িত আছে।

১. জীবিত আমির (এখানে যার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে উদ্দেশ্য) এবং হজ্জ পালনে অক্ষম হতে হবে। যদি হজ্জ ফরয হওয়ার পূর্বে বদলী হজ্জ করানো হয় তাহলে ফরয আদায় হবে না- বরং নফল হিসাবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় পুনরায় নিজে, না হয় অপারগ হলে অপরকে দিয়ে বদলী হজ্জ করাতে হবে।

২. মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিজে হজ্জ পালনের প্রচেষ্টা বন্ধ হবে না। সুতরাং কেউ যদি মৃত্যুর পূর্বে নিজে হজ্জ পালনে সক্ষম হয় তাহলে তাকে তা পালন করা ওয়াজিব।

৩. জীবিত আমির নিজে তার পছন্দসই মামুরকে হজ্জ পালনের নির্দেশ দিতে হবে। যদি তিনি মৃত হন এবং ওসিয়ত করে যান, তাহলে তার পক্ষ থেকে ওয়ারিসগণ এই নির্দেশ দেবেন। তবে ওয়ারিসদের পক্ষ থেকে যে কোন ব্যক্তি তার মৃত স্বজনের কিংবা মা-বাবার হজ্জ পালন করতে পারবেন। এতে মৃত ব্যক্তির কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই (ওসিয়ত হিসাবে)। যদিও ওসিয়ত করা ওয়াজিব- তথাপি ওয়ারিসদের কেউ কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা বদলী হজ্জ করিয়ে নিলে ফরয আদায় হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

৪. হজ্জের যাবতীয় খরচ আমির (বা হজ্জে পাঠানেওয়ালা) কর্তৃক বহন করতে হবে। মামুর (বদলী হজ্জ করছেন এমন ব্যক্তি) যদি নিজের থেকে সামান্য টাকা খরচ করেন, তাতে কোন অসুবিধা নেই।

৫. যার বদলী হজ্জ পালন করা হবে তার নামে পালনকারীকে (ইহরাম বাঁধার সময় ফরয হজ্জের) নিয়ত করতে হবে। মুখে নাম উচ্চারণ উত্তম তবে মনে মনে বললেও হয়ে যাবে।

৬. বদলী হজ্জ শুধুমাত্র একজনের নামে করা যায়। একাধিক ব্যক্তির নামে বদলী হজ্জ করা যাবে না। এমনকি পালনকারী নিজের নামে হজ্জ করতে পারবেন না।

৭. নিজের হজ্জ পালন করেন নি, এমন ব্যক্তির জন্য বদলী হজ্জ করা মাকরুহ। যদিও যার জন্য বদলী হজ্জ করানো হবে তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে এ ব্যাপারে উলামাদের মধ্যে ইখতিলাফ আছে। উলামাদের একদল বলেন, এ ব্যক্তি মক্কা শরীফ পৌঁছার পরই তার উপর নিজের হজ্জ পালন **'ফরয'** হয়ে যায়। সুতরাং মক্কা শরীফ থেকে পরবর্তী বৎসর হজ্জ করে আসা তার জন্য ওয়াজিব। এটা কঠিন ব্যাপার। সুতরাং সতর্ক থাকা প্রয়োজন যে, এরূপ ব্যক্তিকে বদলী হজ্জে পাঠানো থেকে বিরত থাকই ভালো।

৯. কোন মহিলা জিন্দা-মুর্দা অন্য মহিলা কিংবা পুরুষের বদলী হজ্জ পালন করতে পারবেন, যদি যাত্রার জন্য মাহরাম এবং তাঁর স্বামীর (জীবিত থাকলে) অনুমতি থাকে। তবে পুরুষকে দিয়ে বদলী হজ্জ করানো উত্তম।

১০. হজ্জ সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আলিম, যিনি ইতোমধ্যে নিজের ফরয হজ্জ পালন করেছেন, তাঁর দ্বারা বদলী হজ্জ করানো উত্তম।

১১. বদলী হজ্জ পালন করনেওয়ালা যদি নিজের ত্রুটি হেতু হজ্জ পালনে ব্যর্থ হন, তাহলে হজ্জের অর্থ (প্রদান করা হয়ে থাকলে) আমিরকে ফেরৎ দেওয়া তার জন্য ওয়াজিব।

১২. বিশেষ কারণ হেতু কাফ্‌ফারা হিসাবে দম দেওয়া ওয়াজিব হলে, বদলী হজ্জ পালনকারী আমিরের দেওয়া অর্থ থেকে তা আদায় করতে পারবেন।

১৩. কেউ বদলী হজ্জ পালন শেষে মক্কা শরীফ থেকে গেলে কোন ক্ষতি নেই, তবে আমিরের দেশের বাড়িতে ফিরে আসা উত্তম।

১৪. আমিরের নির্দেশ ছাড়া এমনিতেই মামুরের জন্য 'তামাত্তু' বদলী হজ্জ পালন বৈধ নয়। এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। তবে কোন কোন আলিম আমিরের নির্দেশ থাকলে তামাত্তু বদলী হজ্জ হয়ে যাবে বললেও, অধিকাংশের মতে নির্দেশ থাকাসত্ত্বেও মামুরের জন্য তামাত্তু পালন সঠিক হবে না। কিন্তু নির্দেশ থাকার কারণে টাকা ফেরৎ দেওয়া ওয়াজিব নয়। আমিরের হজ্জ কিন্তু সম্পন্ন হবে না। শরহে লুবাব কিতাবে মুল্লা আলী ক্বারী, জুবদাল মানাসিক কিতাবে ইমামে রব্বানী মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী এবং খলীল আহমদ সাহারানপুরী মুহাজিরে মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ এ মত দিয়েছেন। সুতরাং যারা বদলী হজ্জে যাবেন তাদের উচিৎ নয়, নিজের আরামের দিকে চেয়ে তামাত্তু পালন করে আমিরের হজ্জ নষ্ট করা। আর আমির বা যে বদলী হজ্জ করাবেন তারও উচিৎ তামাত্তু হজ্জের নির্দেশ থেকে বিরত থাকা।

বি:দ্র: বদলী হজ্জের মাসআলা-মাসাইল কিছুটা জটিল। বদলী হজ্জের জন্য প্রেরক ও পালনকারী উভয়ে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ আলিমের কাছ থেকে বিষয়টির উপর আরো প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নেবেন। উপরে উল্লেখিত বিষয়বস্তু শুধুমাত্র গাইড হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছি। এ ব্যাপারে যে কোন জটিলতার সম্মুখীন হলে অবশই 'যে জানে তার কাছ থেকে জেনে নেওয়াই' হবে উত্তম পথ।

উমরাহ

'عمرة' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'পরিদর্শন করা'। পারিভাষিক অর্থ **'হিল'** কিংবা **'মীক্বাত'** থেকে ইহরামের নিয়ত তথা **'মুহরিম'** অবস্থায় বাইতুল্লায় যেয়ে তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করা। এরপর মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হওয়া। উমরাহকে **'হজ্জে সাগীর'**

বা ছোট হজ্জও বলে। যার সামর্থ্য আছে তার জন্য জীবনে একবার উমরাহ্‌ পালন করা **'সুন্নাতে মুয়াক্কাদা'**।

উমরার ফজিলত

উমরাহ পালন অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। এ সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। এখানে মূল পাঠাংশসহ দু'টি হাদীস তুলে ধরছি।

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِيْ الْكِيْرُ خَبَثَ

الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

-"হজ্জ ও উমরা একটার পর আরেকটা পালন করো, কারণ এগুলো দারিদ্র্য ও গোনাহকে এভাবে মুছে দেয় যেভাবে কামারের হাপর লৌহ, স্বর্ণ ও রৌপ্য থেকে আবর্জনা দূর করে। একমাত্র জান্নাতই হলো হাজ্জে মাবরুরের বিনিময়।" (তিরমিযি)

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمُ إِنَّ

عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِيْ حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِيْ

"অবশ্যই রামাদ্বানে একটি উমরাহ পালন হজ্জের সমপরিমাণ অথবা আমার সাথে হাজ্জ করার সমান (সওয়াবের কাজ)"। (সহীহ বুখারী, মুসলিম)

জিলহাজ্জ মাসের ৯ থেকে ১৩ তারিখ এই ৫ দিন ছাড়া বৎসরের যে কোন সময় উমরাহ পালন করা যায়। হজ্জের সময় কি্বরান ও তামাত্তু পালনকারী হজ্জযাত্রীকে মক্কা শরীফ পৌঁছে প্রথমে উমরাহ পালন করতে হয়। এরপর ঐ ৫ দিন ব্যতীত যে কোন সময় নফল বা মান্নতের উমরাহ পালন করা যাবে। মনে রাখা দরকার, কি্বরান পালনকারী উমরাহ পালনকালে তাওয়াফ ও সাঈ করবেন মাত্র, মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হতে পারবেন না-

তাকে ইহ্‌রাম অবস্থায় হজ্জের শেষ পর্যন্ত ইহ্‌রামের যাবতীয় নিয়মবিধি যথাযথ অনুসরণ করে থাকতে হবে। ইফরাদ পালনকারীর জন্য উমরাহ নেই। তাওয়াফে কুদুম শেষে ইহ্‌রাম অবস্থায় হজ্জের শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে। তবে নফল বা মান্নতের উমরাহ হজ্জের ৫ দিন ছাড়া যে কোন দিন পালন করতে পারেন।

উমরার ফরযঃ ১. ইহ্‌রাম (নিয়ত ও তালবিয়াহ্‌সহ ইহ্‌রামের কাপড় পরিধান)। ২. নিয়তসহ তাওয়াফ। তাওয়াফের পরে সাঈ আছে, তাই ইজতিবা ও রমল করবেন।

উমরার ওয়াজিবঃ ১. সাঈ (সাফা ও মারওয়ায় ৭ দৌড় দেওয়া)। ২. মাথা মুণ্ডানো।

দ্রঃ মক্কা শরীফ থাকাকালে নফল উমরাহ পালন করতে হলে সাধারণত ইহ্‌রামের কাপড় পরে মসজিদে তানঈমে (যার অপর নাম মসজিদে আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা) যেয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করে ইহ্‌রামের নিয়ত করতে হয়। নিয়তের সময় অবশ্য তিনবার তালবিয়াহ্‌ পড়বেন। এরপর তালবিয়াহ্‌ পাঠ করতে করতে মসজিদুল হারামে পৌঁছে প্রথমে তাওয়াফ, তারপর সাঈ ও শেষে মাথা মুণ্ডিয়ে উমরাহ সমাপ্ত করবেন।

বিঃদ্রঃ *হজ্জযাত্রীদের উচিৎ নিজেদের কাফিলার আমীর বা অভিজ্ঞ আলিমের নিকট থেকে যাবতীয় আহকাম জেনে সঠিকভাবে আমল করা। যে কোন ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে সঠিক পদ্ধতি জেনে নিবেন।*

পরিচ্ছেদ ৪

জরুরী কিছু দু'আ

১. বাড়ি থেকে যাত্রার সময়ঃ

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহ, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ।

অনুবাদ: আল্লাহর নামে, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই।

২. গাড়ি, বিমান ইত্যাদি যানবাহনে আরোহণ করেঃ

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلهِ سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

উচ্চারণ: আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ, সুবহ-নাল্লাজী সাখ্‌খারালানা হা-জা ওমা- কুন্না লাহু মুক্বরিনীন, ওয়াইন্না- ইলা- রাব্বিনা লামুনক্বালিবূন।

অনুবাদ: আল্লাহ সবার বড়, আল্লাহ সবার বড়, আল্লাহ সবার বড়, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ পবিত্র, যিনি অনুগ্রহ করে একে (যানবাহনকে) আমাদের বশীভুত করে দিয়েছেন এবং আমরা একে বশীভুত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব।

৩. ইহরামের নিয়ত

(ক) ইফরাদঃ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল হাজ্জা ফাইয়াসসিরহু লী ওয়াতাক্বাব্বালহু মিন্নী।
অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি হজ্জ করার নিয়ত করলাম। আপনি তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল করুন।

(খ) তামাত্তু: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِيْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল ’উমরাতা ফাইয়াসসিরহালী ওয়াতাক্বাব্বালহা মিন্নী।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি উমরা পালনের নিয়ত করলাম। আপনি তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল করুন।

(ক) ক্বিরান: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِيْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّيْ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল ’হাজ্জা ওয়াল ’উমরাতা ফাইয়াসসিরহুমা লী ওয়াতাক্বাব্বালহুমা মিন্নী।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি হজ্জ ও উমরার নিয়ত করলাম। আপনি এগুলো আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল করুন।

৪. তালবিয়াহ (লাব্বাইক):

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

উচ্চারণ: লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারী-কালাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা, ওয়ান্নি’মাতা, লাকাওয়াল মুল্‌ক, লা-শারী-কালাক।

অনুবাদ: হাজির! হে আল্লাহ! আমি তোমার ইবাদতে হাজির! নিশ্বয়ই তোমার কোন শরীক নাই, আমি হাজির! যাবতীয় প্রশংসা দান ও রাজত্ব অবশ্যই তোমার জন্য, তোমার কোন শরীক নাই।

৫. ইহরামের নামায শেষে দু’আ:

اَللّٰهم إِنِّيْ أَسْأَلُكَ رِضَاكَ والْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা রিদ্বা-কা ওয়ালজান্নাতা, ওয়াআ’উযুবিকা মিন গাদাবিকা ওয়ান্না-র।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টি ও বেহেশত কামনা করছি এবং আপনার রাগ ও আগুন থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

৬. মসজিদে প্রবেশকালে: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াসসালামু ’আলা রাসূলিল্লাহ্‌, আল্লাহুম্মাফতাহ লী আবওয়াবা রাহমাতিক।

অনুবাদ: আল্লাহর নামে, সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রাহমাতের দরোজা উন্মুক্ত করুন।

৭. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদ্বলিক।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি।

৮. বাথরুমে প্রবেশের সময়: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ’উযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবা-য়িছ।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি নাপাকি ও অনিষ্টকারী শয়তান থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৯. বাথরুম থেকে বের হওয়ার সময়: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّيْ الْأَذٰى وَعَافَانِيْ

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লা-হিল্লাজী আজহাবা ’আন্নীল আযা ওয়া ’আ-ফা-নী।

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি আমার কষ্ট দূর করেছেন এবং নিরাপদ রেখেছেন।

১০. নিদ্রা যাওয়ার সময়: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা বিসমিকা আমূতু ওয়াআহইয়া।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! তোমার নামেই আমি ঘুমাই এবং জেগে ওঠি (মৃত্যুবরণ করি এবং জীবিত হই)।

১১. নিদ্রা থেকে জেগে: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

উচ্চারণ: আলহামদুল্লিল্লা-হিল্লাজী আহইয়ানা বা’দা মা- আমাতানা ওয়াইলাইহিন-নুশূর।

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি (নিদ্রারূপ) মৃত্যুর পর আমাকে (পুনর্জাগরিত করে) জীবিত করলেন । তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।

১২. বাইতুল্লাহ্‌ শরীফ নজরে পড়লে: اَللّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ

উচ্চারণ: আল্লা-হু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ।

অনুবাদ: আল্লাহ সবার বড়, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নাই।

১৩. ইসতিলামের সময়: بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লা-হু আকবার।

অনুবাদ: আল্লাহর নামে, আল্লাহ সবার বড়।

১৪. তাওয়াফের সময়: رَبَّنَا آتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِيْ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الأَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

উচ্চারণ: রাব্বানা আ-তিনা ফীদদুনইয়া হাসানা, ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানা, ওয়াক্বিনা ’আজাবান্না-র, ওয়াআদখিলনাল জান্নাতা মা’আল আবরার, ইয়া আজীজু ইয়া গাফফারু ইয়া রাব্বাল ’আ-লামীন।

অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদেরকে মঙ্গল প্রদান করুন, পরকালে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচান এবং পুণ্যবানগণের সঙ্গী করে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহা-পরাক্রমশালী! হে ক্ষমাশীল! হে সর্ব-জাহানের পালনকর্তা!

১৫. যমযম পানের সময়: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ’ইলমান না-ফিয়া, ওয়ারিজক্বান ওয়া-সি’আ, ওয়াশিফা-আম্মিন কুল্লি দা-য়িন।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, প্রচুর (হালাল) রিজিক এবং সকল রোগের নিরাময় কামনা করছি।

১৬. সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে আরোহণের সময়:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ

উচ্চারণ: ইন্নাসসাফা ওয়ালমারওয়াতা মিন শা’আইরিল্লাহ, ফামান হাজ্জালবাইতা আওই’তামারা ফালা- জুনা-হা ’আলাইহি আইয়াত্‌তাওয়াফা বিহিমা- ওয়ামান তাতাওয়্যা’আ খাইরান, ফাইন্নাল্লা-হা শা-কিরুন ’আলীম।

অনুবাদ: “নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়াহ আল্লাহ তা’আলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম, সুতরাং যারা কা’বা ঘরে হজ্জ বা উমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দু’টিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ

তা'আলা অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সে আমলের সঠিক মূল্য দেবেন"। (সূরা বাক্বারা (২) : ১৫৮)

১৭. সাঈর (বাতনে ওয়াদীর দৌড়ের) সময়: رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

উচ্চারণ: রাব্বিগফির ওয়ারহাম, ইন্নাকা আনতাল-আ'আজজুল আকরাম।

অনুবাদ: হে পালনকর্তা! মাফ ও রহম করুন। আপনিই সর্বশক্তিমান এবং সম্মানিত।

১৮. তাকবীরে তাশরিক: ৯ জিলহাজ্জ ফযর থেকে ১৩ জিলহাজ্জ আসরের নামায পর্যন্ত সর্বমোট ২৩ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরিক বলা (১ বার ওয়াজিব ও ৩ বার সুন্নাত) সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষের জন্য ওয়াজিব।

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ: আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ।

অনুবাদ: আল্লাহ সবার বড়, আল্লাহ সবার বড়। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, আল্লাহ সবার বড়, আল্লাহ সবার বড়। আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

১৯. আরাফাতে উপস্থিত থাকার সময়:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়াইউমীতু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।

অনুবাদ: আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই। রাজত্ব এবং প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

২০. কঙ্কর নিক্ষেপের সময়: بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াল্লা-হু আকবার।

অনুবাদ: আল্লাহর নামে, আল্লাহ সবার বড়।

পরিচ্ছেদ ৫

হারাম শরীফের বর্তমান পরিচিতি

কাবা শরীফের ইতিহাস সুদীর্ঘ। অধিকাংশ আলিমের মতে কাবা ঘর পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম আলাইহিস সালামের সময় নির্মিত হয়েছিলো। একে দুনিয়ার প্রথম ঘর হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সময় যে মহা-প্লাবন সংঘটিত হয়েছিলো, তখন এ ঘরটি প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। বহুকাল পর সব জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহ্‌র নির্দেশে কাবা ঘরের পুনর্নির্মাণ করেন। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবুওয়াত-প্রাপ্তির পাঁচ বছর (মতান্তরে ১৫ বছর) পূর্বে কুরাইশরা এর সংস্কার করে। এ সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো হাজারে আসওয়াদ (বা কালো পাথর) স্থাপনসংক্রান্ত সমস্যা ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এর সমাধান। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তিনি এর সুরাহা করেন এবং নিজের হাতে পাথরটি বর্তমান যে কোণে আছে সেথায় স্থাপন করেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বাইতুল্লাহর চতুর্দিকের মসজিদুল হারাম শরীফের আয়তন বেশ ছোট্ট ছিলো। পরবর্তীতে বিভিন্ন খলীফা সংগত কারণেই এর সম্প্রসারণ করেন। আধুনিক যুগে সৌদি বাদশাহ্‌রাও এর সম্প্রসারণ করেছেন। মরহুম বাদশাহ্ ফাহাদ প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সর্বশেষ সম্প্রসারণ করেন। বর্তমান বাদশাহ আবদুল্লাহও সম্প্রসারণ কাজে হাত দিয়েছেন।

বাইতুল্লাহ শরীফের (কাবা ঘরের) প্রতিটি কোণের একেকটি নাম আছে। যে কোণের কাছে সোনার নির্মিত দরজাটি আছে এখানেই হাজারে আসওয়াদ অবস্থিত। এ কোণটির নাম তাই '**রুকনে হাজারে আসওয়াদ**' রাখা হয়েছে। এ কোণ থেকেই তাওয়াফ শুরু করতে হয়। এটা হলো কাবা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ। তাওয়াফকারীরা সম্ভব হলে হাজারে আসওয়াদে চুমু দিয়ে তাওয়াফ শুরু করেন এবং ৭টি চক্করের প্রত্যেকটিতেই এ কোণে পৌঁছে পাথরটিকে চুমু অথবা ইশারায় চুমু দেন।

হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ

-"হাজারে আসওয়াদ বেহেশত থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা দুধের চেয়েও বেশি সাদা বর্ণের ছিলো। পরে মানুষের গোনাহসমূহ একে কালো করে দিয়েছে।" (তিরমিযি)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে আছে, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَلْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَكَانَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ حَتّٰى سَوَّدَتْهُ خَطَايَا أَهْلِ الشِّرْكِ

-"হাজারে আসওয়াদটি বেহেশত থেকে আগত এবং এর রং বরফের চেয়েও অধিক সাদা ছিলো, পরে মুশরিকদের গোনাহ এটিকে কালো করে দিয়েছে।" (মুসনাদে আহমদ, বাইহাক্বী)

পাথরটির আয়তন সম্পর্কে একটি হাদীসে বলা হয়েছে, এটার দৈর্ঘ্য ছিলো এক হাত পরিমাণ। অপর এক হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: "জিব্রাঈল আলাইহিস-সালাম এই পাথরটি বেহেশত থেকে নিয়ে আসেন, তোমরা এটি থেকে উপকার লাভ করো, কেননা যতদিন এটি তোমাদের সামনে বিদ্যমান থাকবে ততদিন তোমাদের মঙ্গল অব্যাহত থাকবে। হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন জিব্রাঈল আলাইহিস-সালাম এটা যেখান থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।" হাজারে আসওয়াদকে চুমু দিলে যে মানুষের গোনাহ কাটে এসব হাদীস থেকে তা স্পষ্ট।

হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে অপর একটি ব্যাপার জড়িত আছে যা হয়তো অনেকেই অবগত নন। ৩১৯ হিজরী সনে 'কারামাতিয়া ইসমাঈলী শিয়া' হাজারে আসওয়াদকে চুরি করে ইহসা নামক স্থানে নিয়ে যায়। দীর্ঘ ২০ বছর সেথায় অবস্থানের পর এটাকে স্বস্থানে পুনঃস্থাপন করা হয়। এই ঘটনা বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কারামাতিয়ারা উঠিয়ে নেওয়ার সময় পাথরটি ভেঙ্গে ফেলে। এতে এটা আটটি টুকরোতে পরিণত হয়। বর্তমানে একটি বড় পাথরে এই আটটি টুকরো প্রোথিত আছে।

হাজারে আসওয়াদ এর এই কোণ থেকে বাইতুল্লাহর ডানদিকে তাওয়াফ শুরু করে, দরজা পার হয়েই পরবর্তী কোণে পৌঁছার পূর্বে কাবা ঘরের সামনে (পূর্বদিকে) অনতিদূরে মাকামে ইব্রাহীম অবস্থিত। বর্তমানে পিতলের তৈরি একটি ছোট্ট কক্ষের ভেতর ইব্রাহীম আলাইহিস-সালামের পায়ের গভীর চাপযুক্ত পাথরটি এখানে রক্ষিত আছে। এই পাথরের

উপর দাঁড়িয়েই ইব্রাহীম আলাইহিস-সালাম কাবা ঘর পুনঃনির্মাণের কাজ করেছিলেন। তাওয়াফ শেষে (সাত চক্কর পূর্ণ করে) সম্ভব হলে এই মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে দু রাকআ'ত তাওয়াফে ওয়াজিব নামায আদায় করতে হয়। অবশ্য মসজিদুল হারামের যে কোন স্থানে নামায পড়া যাবে।

মাকামে ইব্রাহীম পার হয়ে পরবর্তী উত্তর-পূর্ব যে কোণটি আসে এর নাম হলো '**রুকনে ইরাকী**'। এ কোণ থেকে পরবর্তী কোণ পর্যন্ত দেওয়াল-ঘেরা একটি অর্ধ-বৃত্তাকার জায়গা আছে। এটাকে হাতীম বলা হয়। এর অপর নাম হলো হিজরে ইসমাঈল আলাইহিস-সালাম। হাতীম কোনো এক সময় বাইতুল্লাহর মধ্যেই সংযুক্ত ছিলো। সুতরাং হাতীম হচ্ছে কাবা ঘরের একটি অংশ। এ কারণেই হাতীমের ভেতর নফল নামায আদায় করার মধ্যে অত্যন্ত বেশি সওয়াব হয়। হাতীমের ভেতর দিয়ে তাওয়াফ করা জায়েয নয়। বর্তমানে এখানে পাহারারত পুলিশ আছে। এদের কাজ হলো তাওয়াফকারীদের হাতীমের ভেতর প্রবেশ করা থেকে বিরত এবং শৃংখলা বজায় রাখা। তবে হাতীমের ভেতর মাকরুহ ওয়াক্ত ছাড়া অন্য যে কোন সময় প্রবেশ করে নামায আদায় করা সবার জন্য একান্ত করণীয়। বেশ ভিড় থাকে, তথাপি নিয়ত খালিস ও একটু ধৈর্যশীল হলে সুযোগ পাওয়া যায়।

হাতীমের ভেতর অপর একটি বরকতময় স্থান আছে। কাবা শরীফের ছাদে পতিত বৃষ্টির পানি সোনার তৈরি একটি চোঙ্গার মাধ্যমে নীচে এসে পড়ে। সোনার তৈরি এ চোঙ্গাটির নাম হলো '**মিজাবে রাহমাত**'। মিজাবে রাহমাতের পানি পান করা অত্যন্ত বরকতময়। কথিত আছে এ পানি পান করলে অনেক কঠিন রোগ থেকেও আরোগ্য লাভ করা যায়। তবে যেহেতু মক্কা শরীফে বৃষ্টি খুব অল্প হয়, তাই মিজাবে রাহমাতের পানি পান অত্যল্প লোকের ভাগ্যে জুটে। এ বছর হজ্জের শেষ দিবসে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো। সুতরাং অনেকে মিজাবে রাহমাতের পানি পান করে ও তা শরীরে লাগিয়ে ধন্য হয়েছেন। এবার অন্তত একজন কঠিন রোগী মিজাবে রাহমাতের পানিতে গড়াগড়ি ও এটা পান করে আরোগ্য লাভ করেছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

হাতীমের অপরপ্রান্তে পরবর্তী কোণটির নাম হলো '**রুকনে শামী**'। এটা কাবা ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণ। এর পরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটি হলো '**রুকনে ইয়েমনী**'। এ কোণে বেহেশতের একটি পাথর আছে। তাওয়াফকারীরা এটাকে ইশারা করে থাকেন। অনেকে চুমুও দেন। এক হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ

পাথরটিতে চুমু দিয়েছেন। দূর থেকে পাথরটি দেখা যায় না, তবে কাছে গেলে পাথরটির সাদা অংশটুকু দেখা যায়।

হাজারে আসওয়াদে চুমু র জন্য সর্বদাই প্রচণ্ড ভিড় থাকে। এ কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকেই চুমু দিতে পারেন না। আমাদের কাফেলার মোট ৩৭ জনের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন পুরুষ। এদের অনেকেই চেষ্টা করেছেন পাথরে চুমু দিতে। দু'একজন মহিলাও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মাত্র চারজন পুরুষ চুমু খেতে সমর্থ হন।

কাবা শরীফের চতুর্দিকের বড় চত্বরটি (যাকে মুতাফ বা তাওয়াফের স্থান বলে) যেসব মার্বেল পাথর দ্বারা নির্মিত হয়েছে তা অত্যন্ত শীতল থাকে। প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপেও তা উত্তপ্ত হয় না। এছাড়া কিছুক্ষণ পর পরই উপর থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে। এতে তাওয়াফকারীদের ঘর্মাক্ত শরীর শীতল হয়ে যায়। অনেকে বলেছেন, এ বায়ু আল্লাহ্‌র খাস রাহমাত। পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফের নিকটে এভাবে রাহমাতের বারিধারা পতিত হওয়াটা অবশ্যই স্বাভাবিক। এতে আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ নেই। এখানে তাওয়াফরত অবস্থায় আল্লাহ্‌র রাহমাতের নিদর্শন ব্যক্তিগতভাবে অবলোকন করে আপ্লুত হয়েছি, তাঁর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতায় চোখ দু'টো অশ্রুসিক্ত হয়েছে। আর এ অবস্থা শুধু আমার বেলাই হয়েছে তা মোটেই নয়। প্রায় সবাই এ অনুভূতির অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকেন।

মাকামে ইব্রাহীম বরাবর কিছুটা ডানে পবিত্র জমজম কূপটি অবস্থিত। তাওয়াফ শেষে হাজীরা এ কূপের নিকট গিয়ে বরকতময় পবিত্র পানি পান করে থাকেন। বাস্তবে কূপটি বর্তমানে কাবা চত্বরের নীচে (আণ্ডার গ্রাউণ্ডে) অবস্থিত। একটি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে কূপটি দেখা যায় (বর্তমানে এটা আর দেখা যায় না)। এ থেকে প্রাপ্ত পানি মেশিন দ্বারা পাম্প করে তুলে পাশেই পানির অনেকগুলো ট্যাপের মধ্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। ট্যাপে টিপ দিয়ে মুখ লাগিয়ে কিংবা গ্লাসে নিয়েও পানি পান করা যায়। নিয়ম হলো কাবা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে এ পানি পান করা। অনেককে এখানে দু' রাকআ'ত নামাজ পড়তেও দেখেছি।

জমজমের পানির মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একাধিক হাদীস আছে। এক হাদীসে আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

-"পৃথিবীর বুকে উত্তম পানি হলো জমজমের পানি"। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক)

অপর এক হাদীসে আছে:

-"জমজমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয়, তা সফল হয়"। (তাবারানী, আখবারে মাক্কা)

এছাড়া পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"এ পানি বরকতময়, এটা হচ্ছে উত্তম খাদ্য এবং রোগ-ব্যাধির নিরাময়"। (তাবারানী, আখবারে মাক্কা)

"আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, অধিক হারে জমজমের পানি পান করলে মুনাফিকী থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।" (আখবারে মাক্কা)

এ পানি দ্বারাই মিরাজে যাত্রার প্রক্কালে ফিরিশতারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীনা মুবারক ধৌত করেছিলেন। এ ব্যাপারটি সহীহ বুখারীসহ বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

জমজমের পানি দিয়ে ওজু করা ও মাথা এবং মুখমণ্ডল ধৌত করা যায়। তবে গোসল করা উচিত নয় বলে অনেকে বলেছেন।

বর্ণিত আছে, জমজমের পানি একটি বেহেশতের নহর থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। তিন দিক থেকে এ পানি এসে জমজম কূপে মিলিত হয়েছে। প্রথমতঃ বাইতুল্লাহর নিচ থেকে হাজারে আসওয়াদ হয়ে। দ্বিতীয়তঃ সাফা পাহাড় থেকে। তৃতীয়তঃ মারওয়া পাহাড় থেকে পানি এসে জমা হয়। অপর এক তথ্য থেকে জানা যায়, কাবা ঘরের নীচে বড় বড় পাথরের মধ্য দিয়ে সাতটি ঝরনা প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। জমজমের পানি কখনও শেষ হবে না। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস-সালামের আমল থেকে আজ পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ এ পানি ব্যবহার ও পান করে আসছেন। এ বছরই প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ এ পানি প্রত্যহ পান করেছেন এবং বাড়ি ফেরার সময় বড় বড় কৌটা ভরে সাথে নিয়ে গেছেন। এ পানির শেষ নেই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এরূপ পানি আর কোথাও দেখি নি। এ পানি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। পেট পুরে পান করার পরও প্রস্রাবের প্রয়োজন দেখা দেয় না। প্রচণ্ড খিদে পেলে এ পানি পান করলে তা মিটে যায়। এছাড়া শরীরের দুর্বলতাও দূর হয়। অনেক রোগী এ পানির বরকতে আরোগ্য লাভ করেছেন বলে জানা যায়।

জমজম কূপ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য

মুতাফ থেকে কূপের মুখ ১.৫৬ মি. নীচে, মুখ থেকে কূপের মোট গভীরতা ৩০ মি., মুখ থেকে পানির দূরত্ব ৪ মি. নীচে, মুখ থেকে ঝরনার দূরত্ব ১৩ মি.। কূপের তলদেশ

থেকে ঝরনার দূরত্ব ১৭ মি., কূপের ব্যাস ১.৬৪ থেকে ২.৬৬ মিটার। কাবা শরীফের দরজা থেকে কূপের দূরত্ব ২১ মিটার।

মসজিদুল হারাম শরীফ

মসজিদুল হারাম শরীফের বেশিরভাগ দেওয়াল, পিলার ও মিনার মূল্যবান মার্বেল পাথর দ্বারা নির্মিত। বিরাট এই অট্টালিকাটি অত্যন্ত মজবুত করে তৈরি করা হয়েছে। বিল্ডিংয়ের সর্বত্র নিখুঁতভাবে কারুকার্য করা আছে। তুর্কি ইসলামী স্থাপত্যশিল্পের প্রভাব সর্বত্র স্পষ্ট। অত্যন্ত উঁচু ৯টি মিনার বেশ দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়। সমগ্র মসজিদের চতুর্দিকে একবার ঘুরে আসতে অন্তত আধঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে মসজিদুল হারামের সবগুলো গেট বা দরজার তথ্য সংগ্রহ করেছি। নিম্নে নাম্বারসহ সবগুলো গেটের নাম ও বিবরণ তুলে ধরছি।

১. বাবে আব্দুল আজিজ (দু'টি মিনার সম্বলিত প্রধান প্রবেশ দ্বার)। ২. আব্দুল আজিজ সিঁড়ি (দোতলায় উঠার সিঁড়ি)। ৩-৪. নাম ছাড়া দরজা। ৫. বাবুল আজইয়াদ। ৬. বাবে বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু। ৭-৮. ইলেকট্রিক এক্সেলেটর (এগুলো দিয়ে ছাদ পর্যন্ত আরোহণ করা যায়)। ৯. বাবুল হুনাইন। ১০. বাবে ইসমাঈল (আঃ)। ১১. বাবুস্ সাফা (একটি মিনার সম্বলিত সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী গেট)। ১২-১৩. আবু কুবাইস সিঁড়ি (দোতলায় উঠার সিঁড়ি)। ১৪-১৫. আল্-আরকাম এক্সেলেটর। ১৬. নাম ছাড়া দরজা। ১৭. বাবে বনী হাশিম। ১৮. নাম ছাড়া দরজা। ১৯. বাবে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু। ২০. বাবুল আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু। ২১. সেতুর দরজা। ২২. বাবুন্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ২৩. সেতুর দরজা। ২৪. বাবুস্ সালাম। ২৫. সেতুর দরজা। ২৬. বাবে বনী শাইবা। ২৭. বাবুল হাজুন। ২৮. সেতুর দরজা। ২৯. বাবুল মা'লা। ৩০. বাবুল মুদ্দা'আ। ৩১. বাবুল মারওয়া (মারওয়া পাহাড়ের নিকটবর্তী গেট)। ৩২-৩৩. নাম ছড়া দরজা। ৩৪-৩৫. মুরাদ এক্সেলেটর। ৩৬-৩৭-৩৮-৩৯-৪০. নাম ছাড়া দরজা। ৪১-৪২. কুরাইশ এক্সেলেটর। ৪৩. বাবে কুরাইশ। ৪৪. নাম ছাড়া বেইসমেন্টে যাওয়ার রাস্তা। ৪৫. বাবুল ফাত্‌হ (দু'টি মিনার সম্বলিত প্রধান গেট)। ৪৬. বাবে জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহু সেতু। ৪৭-৪৮. নাম ছাড়া দরজা। ৪৯. নাম ছাড়া দরজা। ৫০. বাবুন নাদওয়া সেতু। ৫১. বাবুন নাদওয়া। ৫২. বাবুস্ সাকিয়া। ৫৩. উপরে উঠার এক্সেলেটর। ৫৪. বাবুস্ সামিয়া। ৫৫. বাবুল কুদুস্। ৫৬. বাবুল মদীনা। ৫৭. আল্-মদীনা সেতু। ৫৮. বাবুল হুদাইবিয়া। ৫৯-৬০. নাম ছাড়া দরজা। ৬১. মাহদী আল্-আব্বাসী সেতু। ৬২. বাবুল উমরা (দু'টি মিনার সম্বলিত প্রধান গেট)। ৬৩. নাম

ছাড়া দরজা। ৬৪. এ নাম্বারে কোন গেট বা দরজা চোখে পড়ে নি। ৬৫. আস্-সামিয়া এস্কেলেটর। ৬৬ থেকে ৭৪ পর্যন্ত নাম্বারযুক্ত দরজা আছে, কোন নাম নেই। ৭৫-৭৬-৭৭. বাদশাহ্ ফাহাদ বেইসমেন্টের প্রবেশ দ্বার। ৭৮. বাদশাহ্ ফাহাদ সেতু। ৭৯. বাবুল মালিক ফাহাদ (দু'টি মিনার সম্বলিত প্রধান গেট)। ৮০. বাদশাহ্ ফাহাদ সেতু। ৮১ থেকে ৯০. পর্যন্ত নাম্বারযুক্ত নাম ছাড়া দরজা। ৯১-৯২. বাদশাহ্ ফাহাদ এস্কেলেটর। ৯৩-৯৪. নাম্বারযুক্ত নাম ছাড়া দরজা। ৯৫. বাদশাহ আব্দুল আজিজ সিঁড়ি।

একনজরে মসজিদুল হারাম

পবিত্র বাইতুল্লাহ্ শরীফসহ চতুর্দিকের বিরাট ইমারত সম্পূর্ণটাই মসজিদুল হারামের অন্তর্ভুক্ত। এখানে ড. মুহাম্মদ ইলয়াস আবদুল গনি রচিত 'তারিখে মক্কা মুকাররামা' থেকে আরও কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

মীক্বাত: মক্কা মুকাররমা থেকে বিভিন্ন মীক্বাতের দূরত: **১. কারনুল মানাযিল**, ৮০ কি.মি. [এটা নজদবাসী ও সেদিক থেকে আগত যাত্রীদের মীক্বাত], **২. যাতুল ইরাক**, ৯০ কি.মি. [এটা ইরাকবাসী ও সেদিক থেকে আগত যাত্রীদের মীক্বাত], **৩. ইয়ালামলাম,** ১৩০ কি.মি. [এটা ইয়েমনবাসী ও সেদিক থেকে আগত যাত্রীদের মীক্বাত], **৪. যুল হুলাইফা,** ৪১০ কি.মি. [এটা মদীনাবাসী ও সেদিক থেকে আগত যাত্রীদের মীক্বাত] এবং **৫. জুহফা,** ১৮২ কি.মি. [এটা সিরিয়া ও মিশরবাসী এবং সেদিক থেকে আগত যাত্রীদের মীক্বাত]।

হারাম শরীফের সীমানা: অতীতে হারাম শরীফের সীমানা নির্দেশক মোট ৯৪৩টি পিলার বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ছিল। বর্তমানে এগুলোর মধ্যে গোটা কয়েকটি মাত্র বিদ্যমান আছে। হারাম শরীফ বা পবিত্র স্থানের মোট ক্ষেত্রফল ৫৫০ স্কোয়ার কিলোমিটার। মিনা ও মুজদালিফা হারাম শরীফের ভেতরে অবস্থিত কিন্তু আরাফাত ময়দান এর বাইরে।

৬টি ঐতিহাসিক স্থানকে হারাম শরীফের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা:-

১। **মসজিদে তানঈম বা আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা মসজিদ**, কাবা শরীফ থেকে দূরত্ব ঃ ৭.৫ কি.মি.। মক্কা শরীফ থাকাকালে এই মসজিদে যেয়ে হজ্জযাত্রীদেরকে উমরার ইহরাম পরতে হয়।

২। **নাখলা,** কাবা শরীফ থেকে দূরত্ব ঃ ১৩ কি.মি.। এই স্থানে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে ফেরার পথে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত জায়েদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু।

৩। **আযাতু লাবান (উক্বাইশিয়া),** কাবা শরীফ থেকে দূরত্ব ঃ ১৬ কি.মি.। এই স্থানে বনী খুজাআদের বাসস্থান ছিল। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর কুরাইশদের প্ররোচনায় বনী বকর এদেরকে হামলা করে। এতে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ হয়, কারণ বনী খুজাআ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিত্র গোষ্ঠি ছিল।

৪। **যি'রানাহ,** কাবা শরীফ থেকে দূরত্ব ঃ ২২ কি.মি.। এই স্থানের নাম একজন মহিলার নামানুসারে করা হয়েছে। বনী তামীম গোত্রের এই মহিলার পূর্ণ নাম ছিল রীতা যি'রানাহ। পবিত্র কুরআন শরীফের একটি আয়াতে অপ্রকৃতিস্থ এই মহিলা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তোমরা হয়ো না ঐ উন্মাদিনী নারীর মতো, যে তার সূতা মজবুত করে পাকানোর পর তার পাক খুলে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে! ... ...[সূরা নাহল ঃ ৯১]। উল্লেখ্য এই মহিলা সারা দিন সূতা দ্বারা কাপড় বুনতো এবং পরে তা আবার ছিড়ে টুকরো টুকরো করে দিত। পবিত্র কুরআন শরীফে এই মহিলার উপমা বর্ণিত হওয়ায় সে এবং এই স্থানটি পরবর্তীতে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

৫। **হুদাইবিয়া,** কাবা শরীফ থেকে দূরত্ব ঃ ২২ কি.মি.। এখানে ঐতিহাসিক দু'টি ঘটনা ঘটেছিল। এর প্রথমটি হলো বাইআতে রিদ্বওয়ান (৬ হিজরী)। আর দ্বিতীয়টি প্রখ্যাত হুদাইবিয়ার সন্ধি।

কাবা শরীফঃ কুরআন শরীফে কাবা শরীফকে কাবা, বাইতুল হারাম, বাইতুল্লাহ্, বাইতুল আতিক ও কিবলা নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

মোট ১২ বার কাবা শরীফের নির্মাণ, মেরামত, পুনঃনির্মাণের কাজ হয়েছে ঃ ১। ফিরিশতাদের দ্বারা তৈরি, ২। হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক মেরামত, ৩। হযরত শীস (আঃ) কর্তৃক মেরামত, ৪। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) কর্তৃক পুনঃনির্মাণ, ৫। আমালিক্বা নামক এক জাতি দ্বারা মেরামত, ৬। জুহরুম গোত্র দ্বারা মেরামত, ৭। কুসাই বিন ক্বিলাব কর্তৃক মেরামত, ৮। কুরাইশদের দ্বারা সংস্কার, ৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহু কর্তৃক পুনঃনির্মাণ, ১০। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কর্তৃক মেরামত, ১১। তুর্কি সুলতান মুরাদ দ্বারা সংস্কার কাজ এবং ১২। মরহুম বাদশাহ ফাহাদ কর্তৃক মেরামত।

উচ্চতা: কাবা শরীফের উচ্চতা ১৪ মি., মুলতাযাম বা দরজার দিকের দেওয়ালের প্রস্থ ১২.৮৪ মি., হাতীমের দিকের দেওয়ালের প্রস্থ ১১.২৮ মি., হাতিম ও রুকনে

ইয়েমনীর মধ্যস্থিত দেওয়ালের প্রস্থ ১২.১১ মি. এবং রুকনে ইয়েমনী ও রুকনে হাজারে আসওয়াদের মধ্যস্থিত দেওয়ালের প্রস্থ হলো ১১.৫২ মি.।

কাবা শরীফের অভ্যন্তরে তিনটি পিলার, উপরে ছাদে ওঠার একটি সিঁড়ি কক্ষ আছে যার প্রবেশ পথকে বলে বাবুত-তাওবাহ।

দরজা: কাবা শরীফের দরজা সম্পর্কে জানা যায়, এটার মধ্যে মোট ২৮০ কিলোগ্রাম স্বর্ণ আছে। দরজার মধ্যে দু'টি পার্ট আছে এর একেকটির উচ্চতা ৩.১ মি., প্রস্থ ১.৯ মি., ঘনত্ব ৫০ সে.মি., মাতাফ বা তাওয়াফের স্থান থেকে দরজা ২.২৫ মি. উপরে স্থাপিত।

কাবা শরীফের কালো গিলাফ সম্পর্কে কিছু তথ্যঃ এটা তৈরির জন্য আলাদা একটি ফেক্টরী আছে। প্রত্যেক বছর ৯ জিলহাজ (উকুফে আরাফাতের দিন) নতুন গিলাফ পরানো হয়। গিলাফের আয়তন ঃ উচ্চতা ১৪ মি., ব্যবহৃত সিল্কের পরিমাণ ৬৭০ কিলোগ্রাম, গিলাফের মোট ক্ষেত্রফল ৬৫৮ মিটার স্কোয়ার। হযরত ইসমাঈল (আঃ) কাবা শরীফকে সর্বপ্রথম গিলাফ দ্বারা আবৃত করেছিলেন।

সাফা-মারওয়াঃ কাবা শরীফ থেকে সাফা পাহাড়ের দূরত্ব ১৩০ মি. এবং মারওয়ার দূরত্ব ৩০০ মি., এক পাহাড় থেকে ওপর পাহাড়ের দূরত্ব ৩৯৪.৫ মি., মাস'আ বা দৌড়ের জায়গার মোট প্রস্থ ২০ মিটার।

মসজিদুল হারামে মোট চারটি ফ্লোর আছে। ১. বেইসমেন্ট, ২. গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৩, প্রথম তলা, ৪. ছাদ। এই চার ফ্লোরে সর্বমোট ৭ লক্ষাধিক মানুষ এক সঙ্গে নামায আদায় করতে পারেন যার মোট ক্ষেত্রফল ২,৮০,০০০ মিটার স্কোয়ার। এই চার ফ্লোর ছাড়াও মসজিদের চতুর্দিকে বিরাট কোর্টইয়ার্ড বা মার্বেল পাথরের উঠোন আছে যার ক্ষেত্রফল ৩,২২,০০০ মিটার স্কোয়ার। রাস্তাঘাট ছাড়াও একই সঙ্গে মোট সোয়া নয় লক্ষাধিক মানুষ নামায পড়তে সক্ষম। বেশি ভিড়ের সময় মুসল্লিদের মোট সংখ্যা ১৫ থেকে ২০ লক্ষে গিয়ে পৌঁছে।

মসজিদুল হারামে মোট ৯টি উঁচু মিনার আছে। এগুলো সম্পর্কে আরো তথ্য ঃ প্রতিটির উচ্চতা ৮৯ মি., গম্বুজের ব্যাস ৭.৩৩ মি., উপরে স্থাপিত অর্ধ-চন্দ্রের প্রস্থ ৫.৮২ মি.। প্রত্যেক মিনারের মধ্যে দু'টি বেলকোনি আছে। নীচের চতুর্ভুজ আকৃতির ফাউন্ডেশনের মাপ হলো ৩২.৩৫ মি. প্রতিটি সাইড।

পরিচ্ছেদ ৬

মক্কা শহরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক জায়গা

হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শহরে নুবুওয়াত-প্রাপ্তির পর দীর্ঘ ১০ বছর কাটিয়েছিলেন। এখানে ইসলামের ইতিহাসের অনেক নিদর্শন এখনও বিদ্যমান। হজ্জের সফরে অনেক হাজীরাই হজ্জের পর মক্কা শহরে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করে থাকেন। এ সুযোগে মক্কা শহরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করা যায়। আমাদের কাফেলার সবাই মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মক্কাস্থ ৭টি ভিন্ন জায়গায় জিয়ারতে যাই। নিম্নে এসব স্থানের পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরছি।

১. জাবালে সূর

এই পাহাড়ের উপর **"গারে সূর"** গুহা অবস্থিত। পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের সময় স্বীয় বন্ধু ও সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু-কে সঙ্গে নিয়ে কুরাইশ কাফিরদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য এ গুহায় তিনদিন পর্যন্ত আত্মগোপন করেন। গুহার ভেতর ঢোকার পরই একটি মাকড়শা এর মুখে প্রকাণ্ড এক জাল বুনে। এছাড়া একজোড়া কবুতর বাসা বেঁধে বাচ্চা জন্ম দেয়। কাফিররা এক পর্যায়ে এই গুহার একেবারে নিকটবর্তী হলো। ভেতর থেকে তাদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। এসময় আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু আতঙ্কিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওরা তো একেবারে কাছে এসে গেছে। তারা সংখ্যায় অনেক, আমরা মাত্র দু'জন। জবাবে দৃঢ়কণ্ঠে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে আবু বকর! আমরা দু'জন নই, তিন জন। মনে রেখো আল্লাহ্ পাক আমাদের সাথী"। এরপর কবুতরের বাসা এবং মাকড়শার জাল দেখে কাফিররা বলাবলি করতে লাগলো, "এ গুহার ভেতর কোন মানুষ প্রবেশ করতে পারে না।" এই বলে তারা চলে গেল। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবীবকে সামান্য একটি মাকড়শার জাল ও কবুতরের নীড় দ্বারা রক্ষা করলেন।

গারে সূরে আরোহণ করতে অন্তত ২ ঘণ্টা সময় লাগে। বেশ উঁচু এই পাহাড়ে অনেকেই আরোহণ করতে অপারগ। তবে আমাদের চোখে পড়লো

অনেক মানুষ উপরের দিকে আরোহণ করছেন। কিছুক্ষণ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এবং মনে পড়লো সেদিনের বিপদের কথা। হায়! পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তরে কতো কষ্ট সহ্য করেছেন, কতো বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। এই পাহাড় এবং এর শৃঙ্গের গুহাটি সেই ত্যাগের জ্বলন্ত সাক্ষ্য আজো বহন করে যাচ্ছে।

সূর পাহাড় সম্পর্কে আরো কিছু তথ্যঃ মসজিদুল হারাম থেকে ৪ কি.মি. দক্ষিণে সূর পাহাড় অবস্থিত। সাগর লেবেল থেকে এর উচ্চতা ৮৫৮ মি. এবং ভূতল (গ্রাউন্ড লেবেল) থেকে উচ্চতা ৪৫৮ মি.। পাহাড়ের চূড়ায় গুহাটি অবস্থিত। এর অভ্যন্তরীণ উচ্চতা হচ্ছে ১.২৫ মি., প্রস্থ ৩.৫ মি. ও দৈর্ঘ্য ৩.৫ মি.। গুহার মধ্যে দু'টি প্রবেশ পথ আছে। এর একটি পশ্চিম দিকে। ছোট্ট এই প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকতে যেয়ে মাটিতে শোতে হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু এ পথ দিয়েই গুহায় প্রবেশ করেছিলেন। বাস্তবে সে যুগে এটাই ছিল একমাত্র প্রবেশ পথ। পূর্ব দিকে আরেকটি প্রবেশ পথ আছে। এটা পরবর্তীতে পর্যটকদের সুবিধার্থে তৈরি করা হয়েছে। এর উচ্চতা ৩.৫ মি.।

২. আরাফাতের ময়দান ও জাবালে রাহমাত

হজ্জের দিন আরাফাতের ময়দান, মসজিদে নামিরা এবং জাবালে রাহমাত প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে দেখার সুযোগ হয়নি। এবার এখানে এসে জাবালে রাহমাতে আরোহণ করে আরাফাতের বিশাল ময়দানটি ভালো করে দেখতে পেলাম। হজ্জের দিন এই ময়দানে দু' টুকরো শ্বেত বস্ত্রে আবৃত লাখ লাখ মানুষের সমাগম হয়েছিলো। এখানেই হাজীরা সারাদিন আল্লাহ্‌র দরবারে মাগফিরাত কামনা করেছেন। এখান থেকে সূর্যাস্তের পর বিদায় হয়েছেন নিষ্পাপ শিশুর মতো হয়ে। আরাফাতের ময়দানের আয়তনে মনে হলো এখানে অন্তত কোটি মানুষের সংকুলান অনায়াসেই হবে। ময়দানটি পাহাড়-পর্বতে বেষ্টিত। রৌদ্রের তাপে খা-খা করছে। এই ময়দানই কিয়ামতের মাঠের নমুনা। অনেক নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায়, এখানেই কিয়ামত ঘটবে।

আমরা জাবালে রাহমাত নামক ছোট্ট টিলাটির উপর আরোহণ করে সেখানে স্থাপিত সাদা পিলারটির নিকটে গিয়ে দাঁড়ালাম। পিলারের চতুর্দিকে কতটুকু জায়গা পাকা করা। তবে সৌদি পুলিশ ওখানে কাউকে উঠতে দেয় নি। কেউ

কেউ এখানে দু' রাকআ'ত নামায আদায় করার চেষ্টা করছিলেন। সৌদি পুলিশ বললো, এটা বিদআত। এখানে নামায পড়া বা ইবাদতের কোন নিয়ম নেই। এই পিলারটির কাছে দাঁড়িয়েই কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী আমাদের পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণটি প্রদান করেন। এসময় তাঁর সঙ্গে এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী ১ লাখ ২৪ হাজার সাহাবী রাদ্বিআল্লাহু আনহুম ছিলেন। এই টিলার উপরই আদি মানুষ হযরত আদম (আঃ)-এর দু'আ কবুল হয়েছিলো। এখানে দাঁড়িয়ে কান্না-বিজড়িত কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করেন, "রাব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়াইল্লাম তাগ্বফিরলানা ওয়াতারহামনা লানা কু-নান্না মিনাল খাসিরীন।" এই আরাফাতের ময়দানেই দীর্ঘকাল পর আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর মিলন ঘটেছিলো।

জাবালে রাহমাতের অদূরেই আরাফাতের বিরাট মসজিদে নামিরা অবস্থিত। মসজিদটি আমরা দূর থেকেই অবলোকন করেছি। সুতরাং এর ভেতরের পূর্ণ বৃত্তান্ত এ প্রসঙ্গে তুলে ধরতে আমি অপারগ। এই মসজিদ থেকেই ইমাম সাহেব আরাফাতের গুরুত্বপূর্ণ খুতবাটি প্রদান করে থাকেন। এই মসজিদের অপর নাম মসজিদে ইব্রাহীম (আঃ)।

জাবালে রাহমাত সম্পর্কে আরো কিছু তথ্যঃ পাহাড়ের অপর নামসমূহ হচ্ছে ইলাল, নাবিত ও কুরাইন। ভূতল থেকে এর উচ্চতা হলো ৬৫ মি.। সাগর লেবেল থেকে উচ্চতা ৩৭২ মি.। উত্তর দিকের দৈর্ঘ্য ১৭০ মি. এবং দক্ষিণের দৈর্ঘ্য ২০০ মি.। টিলার পশ্চিম দিকের দৈর্ঘ্য ১০০ মি. ও পূর্বের দৈর্ঘ্য ১৭০ মি.। টিলার মোট ক্ষেত্রফল হচ্ছে ৬৪০ মিটার স্কোয়ার। টিলাটি মসজিদে নামিরা থেকে ১.৫ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত।

৩. জাবালে নূর

এই পাহাড়ের উপরই প্রখ্যাত হেরা গুহাটি অবস্থিত যেখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সর্বপ্রথম ওহি নাজিল হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পাহাড়ে আরোহণ করে গুহার ভেতর ঢুকে একা একা বসে বহুদিন আল্লাহ্‌র ধ্যান করেছেন। শেষ পর্যন্ত এক নিশীতে (পবিত্র রমযান শরীফের শবে ক্বদর রাতে) জিব্রাঈল (আঃ) ওহিসহ তাঁর কাছে আসলেন। তিনি বললেন, পড়ুন! তিনবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি পড়তে জানি না"। জিব্রাঈল (আঃ) তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর নবীজী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তে লাগলেন, "ইকরা বিছমি রাব্বিকাল লাজী খালাক্ব ..."। এই গুহায়ই পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুবুওয়াত লাভ করেন।

জাবালে সূরের মতো এই পাহাড়ও বেশ উঁচু। এতে আরোহণ করতে অন্তত দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। অনেকেই এই পাহাড়ে আরোহণ করছেন দেখতে পেলাম। আমাদের কাফেলার কেউ আরোহণ করেন নি। এখানে দাঁড়িয়ে একটি জিনিস ভাবতে লাগলাম। কিছু বর্ণনায় জানা যায়, বিবি খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা কোন কোন সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য পানাহার নিয়ে পাহাড়ে আরোহণ করতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির সময় এই মহিয়সী মহিলার বয়স ছিলো অন্তত ৫৫ বছর। সুতরাং প্রৌঢ়া একজন মহিলা হয়ে তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করে এই পাহাড়ে আরোহণ করেছেন। আমার মনে হয় এ যুগে এরূপ বয়স্কা খুব অল্প মহিলা এ পাহাড়ে আরোহণের সাহস করতে পারবেন। হেরা গুহাটি হলো পাহাড়ের একেবারে শৃঙ্গে, সুতরাং সমগ্র পাহাড়টিই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা আরোহণ করতেন। এখানেও ইসলামের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গিনীর ত্যাগের জ্বলন্ত নিদর্শন সহজেই অনুমেয়।

জাবালে নূর সম্পর্কে কিছু তথ্যঃ সাগর লেবেল থেকে উচ্চতা, ৬২১ মি.। গ্রাউন্ড লেবেল থেকে উচ্চতা, ২৮১ মি.। গারে হেরার প্রবেশ পথের প্রশস্ততা মাত্র ৬০ সে.মি.। এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৩ মি. ও উচ্চতায় ২ মি.। গুহার ভেতর দু'ব্যক্তি একত্রে দাঁড়িয়ে ও একজন বসে নামায আদায় করতে পারেন।

৪. জান্নাতুল মা'লা

মসজিদুল হারামের নিকট থেকে এই বিখ্যাত কবরস্থানে যেতে ১০ থেকে ১৫ মিনিট সময় লাগে। আমরা সকলে পায়ে হেটেই সেখানে পৌঁছলাম। এই কবরস্থানেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিআল্লাহু আনহা এর মাজার শরীফ অবস্থিত। পাশেই টিলার উপর তাঁর বাড়ি ছিলো। দূর থেকে আমরা জিয়ারত করলাম। এই কবরস্থানে আরো অনেক সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম সমাহিত আছেন। হযরত

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং তাঁর মাতা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহার কবরও এই মুবারক স্থানে অবস্থিত।

চোখে পড়লো খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার কবরের অনতিদূরে একটি লোক বসে আছেন। তিনি হয়তো কোন স্থানীয় ব্যক্তি হবেন। যা হোক, এখানে দাঁড়িয়ে কবর জিয়ারতের সময় পেয়ারে নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্ত্রী খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার ত্যাগের কথা স্মরণ হলো। তিনিই নবীজীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দীর্ঘ ২৫ বছর দেখাশোনা করেছিলেন। নবীজীও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে এতো ভালোবাসতেন যে, তিনি জীবিত থাকাবস্থায় আর দ্বিতীয় কোন বিবাহ করেন নি। এই মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বয়সে ১৫ বছরের বড় এবং অত্যন্ত ধনীও ছিলেন। ইসলামের জন্য তিনি সবকিছু বিলিয়ে দেন। হযরত খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহার অপর গৌরব হচ্ছে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। এটা নারীজাতির জন্যও গৌরবের বিষয় বৈকি। ধন্য বিবি খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহা, ধন্য আপনার জীবন! মনে মনে এই মহিয়সী নারীর জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে প্রাণখুলে দু'আ করলাম। এছাড়া এখানে সমাহিত আছেন অনেক সাহাবায়ে কিরাম, মাশাইখ, ওলিআল্লাহ, উলামা, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ও সাধারণ মুসলমান। আমাদের জানামতে চিশতিয়া-সাবিরিয়া তরীকার কয়েকজন মাশাইখও এই কবরস্থানে সমাহিত আছেন। এরা হলেন হযরত ফুজাইল ইবনে আয়াজ, হযরত উসমান হারুনী, হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী এবং আমাদের বাংলাদেশের হযরত আবদুল হক শায়খে গাজিনগরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

জান্নাতুল মা'লায় এখনও মুসলমানদের কবর হয়ে থাকে। বিরাট এলাকাজুড়ে স্থাপিত এই কবরস্থানে অসংখ্য কবর চোখে পড়লো।

৫. মসজিদে জ্বিন

মক্কা শহরে মসজিদে জ্বিন নামক একটি ছোট্ট মসজিদ আছে। বর্তমানে পুরনো কোন মসজিদের নিদর্শন এখানে চোখে পড়ে নি। এখন এ জায়গায় আধুনিক একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

এই জায়গায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল জ্বিনকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা জ্বিনে এ ব্যাপারে বর্ণনা আছে। মূলতঃ এ ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম শুধু মানবজাতির জন্যই নবী ছিলেন না, তিনি জ্বিন জাতিরও নবী। জ্বিন জাতির মধ্যে যারা মুসলমান তাদেরকে জ্বিন্নে মু'মিন বলা হয়। অনেকের মতে এরাও হজ্জব্রত পালন করে থাকেন। যদিও আমরা কেউ তাদেরকে দেখতে পাই না। মসজিদে জ্বিন জান্নাতুল মা'লা থেকে বেশি দূরে নয়।

৬. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মস্থান

ঈসায়ী সন মুতাবিক আজ থেকে ১৪৪২ বছর পূর্বে এক শুভ-মুহূর্তে রাহমাতুল্লিল আলামীন, সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতামান্নাবিয়্যিন জনাব মুহাম্মাদ মুস্ত ফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা আমিনার কোলে জন্মগ্রহণ করেন। যে ঘরটিতে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বজগতের আশীর্বাদ আত্মপ্রকাশ করেন সে ঘরটির স্থান এখনও চিহ্নিত আছে। তবে বর্তমানে এখানে একটি পাকা বাড়ি নির্মিত হয়েছে। বাড়িটি মসজিদুল হারাম থেকে কাছেই। বাড়ির ভেতর এখন আর তেমন কিছু নেই। আমাদের কাফেলার প্রধান জনাব ক্বারী উবায়দুল্লাহ্ সাহেব জানালেন, মক্কাস্থ গভর্ণর এ বাড়িটি বরকতের জন্য নিজের অফিস হিসেবে ব্যবহার করেন। বাড়ির ভেতর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তবে জানা গেছে ভেতরে একটি লাইব্রেরী আছে। দরজাটি সবসময় বন্ধ থাকে। কিন্তু অনেকেই দরজায় চুমো দেন এবং বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দরূদ ও না'তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করেন। কেউ কেউ এখানে দাঁড়িয়ে নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইশ্‌কে ক্রন্দনও করে থাকেন। সৌদি কর্তৃপক্ষের মতে এখানেও কোন ইবাদত করা জায়েয নেই। সুতরাং কাউকে নামায পড়তে দেখলেই তারা তাড়িয়ে দেন।

এই ঘরটির নিকটেই আবু তালিব উপত্যকা ছিল যেখানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ তিন বছর তাঁর গোত্রসহ সমাজচ্যুত অবস্থায় অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কালাতিপাত করেছিলেন। বর্তমান লাইব্রেরী বিল্ডিংটি ১৯৫০ সালে শেখ আব্বাস ক্বাতান নির্মাণ করেন। এর পূর্বে আব্বাসী খলীফা হারুন-উর-রশীদ এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

৭. উম্মে হানী

মসজিদুল হারামের ভেতর বায়তুল্লাহর রুকনে ইয়ামানী বরাবর একটি জায়গা আছে। এ জায়গাটি ছিলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফুফু উম্মে হানী রাদ্বিআল্লাহু আনহার বাড়ি। কোনো কোনো রিওয়ায়েত থেকে জানা যায়, আল্লাহ্র হাবীব যে রাতে মিরাজে গমন করেন সে রাত্রে তিনি এই বাড়িতে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। গভীর নিশিতে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বুরাকসহ এ বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়েন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেগে উঠলেন। জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, "হে আল্লাহ্র হাবীব! আল্লাহ্ পাক আপনাকে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আজ রাত আপনি জেরুজালেমের বায়তুল মুকাদ্দাস হয়ে মহাবিশ্ব পাড়ি দিয়ে আল্লাহ্র আরশে আজীম পর্যন্ত আরোহণ করবেন।" এরপর শুরু হলো মিরাজের অপূর্ব ভ্রমণ।

বর্তমানে মসজিদুল হারামের ভেতর এই বাড়িটি ঢুকে গেছে। এর আলাদা কোন চিহ্ন নেই। তবে এখানে একটি পিলার আছে যার গঠন অন্যান্য সকল পিলার থেকে স্বতন্ত্র। অনেকের মতে এই পিলারেই বুরাককে বেঁধে রাখা হয়েছিল বা বুরাক এখানেই দাঁড়ানো ছিল। এছাড়া জায়গাটি কিছু উঁচু যা উম্মে হানীর পরিচিতি বহন করে। অনেকেই এখানে বসে আল্লাহ্র ইবাদত করেন।

পরিচ্ছেদ ৭

মসজিদে নববীর বর্তমান পরিচিতি

عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ:مَا بَيْنَ قَبْرِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ

-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার কবর এবং মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান হলো বেহেশতের একটি বাগান।" (তাবারানী)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ زَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ

-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে আমার ইন্তিকালের পর আমার কবর জিয়ারত করবে সে যেনো জীবিতাবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করলো।" (তাবারানী)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে আমার কবর জিয়ারত করবে তার জন্য শাফায়াত করা আমার জন্য ওয়াজিব হবে।" (সুনানে দারে কুতনী)

ইসলামের দ্বিতীয় পবিত্রতম শহর হচ্ছে মদীনা মুনাওয়ারা। এই শহরেই আখেরী যামানার নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাওযায়ে আতহার অবস্থিত। রাওযায়ে আতহার সংলগ্ন বিরাট মসজিদটিই 'মসজিদে নববী' বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মসজিদ নামে খ্যাত। ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে একাধিকবার

এই মসজিদকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পবিত্র মক্কাস্থ হারাম শরীফের মতো মরহুম বাদশাহ্ ফাহাদ প্রচুর অর্থের বিনিময়ে মসজিদে নববীরও সম্প্রসারণ করেছেন।

এবারের হজ্জব্রত পালন শেষে ৯দিন পবিত্র মদীনা মুনুওয়ারায় আমরা অবস্থান করি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে মসজিদে নববীর বিভিন্ন স্থান ও গেটগুলো পরিদর্শন করেছি। নিম্নে এ ব্যাপারে কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

মসজিদে নববীতে সর্বমোট ৪১টি গেট আছে। রাওযায়ে আতহার জিয়ারতের জন্য যে গেট দিয়ে জিয়ারতকারী প্রবেশ করেন এটাই হচ্ছে ১ নং গেট। গেটগুলোর নাম ও বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণিত হলো।

১. বাবুস্-সালাম (এ গেট দিয়ে জিয়ারতের জন্য প্রবেশ করতে হয়)। ২. বাবে আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু আনহু- বাস্তবে তিনটি দরজা (২এ, ২বি, ২সি)। ৩. বাবুর রাহমাত। ৪. বাবুল হিজরত (বাস্তবে দু'টি দরজা- ৪এ এবং ৪বি)। ৫. বাবুল কুবা (বাস্তবে তিনটি দরজা- ৫এ, ৫বি, ৫সি, একটি উপরে উঠার সিঁড়ি)। ৬. উপরে উঠার সিঁড়ি (৬এ এবং ৬বি)। ৭. বাবুল মালিক আস্-সৌদ। ৮. বাবুল মালিক আস্-সৌদ (বাস্তবে ৫টি দরজা- ৮এ, ৮বি, ৮সি, ৮ডি ও ৮এইচ)। ৯. বাবুল মালিক আস্-সৌদ। ১০এ. এবং ১০বি. উপরে উঠার সিঁড়ি। ১১এ. ১১বি. বাবুল আ'কিক। ১২, ১৩এ. ১৩বি. ১৩সি. ১৩ডি. ১৩এইচ এবং ১৪. বাবুস্ সুলতান আব্দুল মজিদ। ১৫এ, ১৫বি. উপরে উঠার সিঁড়ি। ১৬, ১৭এ. ১৭বি. ১৭সি. ১৭ডি. ১৭এইচ এবং ১৮. বাবে উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। ১৯. বাবুল বদর। ২০, ২১এ. ২১বি. ২১সি. ২১ডি. ২১এইচ এবং ২২. বাবুল মালিক ফাহাদ (এটি মসজিদে নববীতে প্রবেশের সর্বাপেক্ষা বড় গেট। দু'টি মিনার সম্বলিত এ গেটের উপরে ৭টি ছোট্ট গম্বুজ আছে।)। ২৩. বাবুল উহুদ। ২৪, ২৫এ. ২৫বি. ২৫সি. ২৫ডি. ২৫এইচ এবং ২৬. বাবে উসমান ইবনে আফ্ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু। ২৭এ এবং ২৭বি উপরে উঠার সিঁড়ি। ২৮, ২৯এ. ২৯বি. ২৯সি. ২৯ডি. ২৯এইচ এবং ৩০. বাবে আলী ইবনে আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। ৩১এ. এবং ৩১বি. উপরে উঠার সিঁড়ি। ৩২এ. এবং ৩২বি. বাবে আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু। ৩৩, ৩৪এ. ৩৪বি. ৩৪ডি. ৩৪সি. ৩৪এইচ এবং ৩৫. বাবুল মালিক আব্দুল আজিজ। ৩৬এ এবং ৩৬বি উপরে উঠার সিঁড়ি। ৩৭এ. ৩৭বি. এবং ৩৭সি. বাবুল মক্কা। ৩৮এ. এবং ৩৮বি. বাবে বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু। ৩৯. বাবুন্ নিসা। ৪০. বাবে জিব্রাঈল (আঃ)। ৪১. বাবুল বাকী (এই দরজা দিয়ে জিয়ারত শেষে বেরিয়ে আসলে সামনেই অদূরে জান্নাতুল বাকী কবরস্থান চোখে পড়ে)

মসজিদে নববীর ভেতরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান

মসজিদে নববীর ভেতরে কিছু ঐতিহাসিক স্থান আছে। পবিত্র মাজার শরীফ মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। স্বর্ণ, লৌহ ও পিতলের নির্মিত গেট দ্বারা মাজার শরীফের কক্ষটি বেষ্টিত করে রাখা হয়েছে। ভেতরেও আরেকটি দেওয়াল আছে, যার ফলে বাইর থেকে ছিদ্র বরাবর তাকিয়ে মাজার শরীফ দেখা যায় না। মাজার শরীফের দেওয়াল-বেষ্টিত কক্ষটির ভেতরই হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা এবং হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহার হুজরা ছিলো।

বাবুস্‌ সালাম গেট দিয়ে ঢুকে প্রথমেই যে মিহরাবটি বাম দিকে দেখতে পাওয়া যায়, সেটা হলো মিহরাবে সুলাইমানী। এটির অপর নাম 'মিহরাবে হানাফী'। তুর্কি সুলতান সুলাইমানের আমলে এটা নির্মিত হয়। এরপর তুর্কি শাসনামলে নতুনভাবে নির্মিত একটি মিম্বর আছে। এটাই হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিম্বর। এর পরে আরেকটি মিহরাব চোখে পড়ে। এ মিহরাবটিই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র মিহরাব। এখানে তিনি নামায পড়তেন। মিহরাবের সঙ্গে সংযুক্ত ডান পার্শ্বের (কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালে) কোণের পিলারটির ভেতরে এক খণ্ড খেজুরের শখা আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শাখায় ভর করে খুতবা প্রদান করতেন। এটাকে উস্তুনে হান্নানাহ বলে। তারপর যখন মিম্বর তৈরী হলো তখন তিনি এটাতে আর ভর করে দাঁড়ালেন না। এরফলে দেখা গেল একদিন এই শাখাটি শিশুদের মতো ক্রন্দন করছে। সাহাবায়ে কিরামও এই ক্রন্দন শোনতে পেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে এসে এটিকে হাত বুলিয়ে দিলেন, যেমনটি একটি শিশুকে বুলিয়ে দেওয়া হয়। এতে শাখাটির কাঁদাকাটি বন্ধ হয়ে গেল। সিরাত-গ্রন্থ থেকে জানা যায়, শাখাটি যখন কাঁদছিল তখন উপস্থিত সকল সাহাবায়ে কিরামও ক্রন্দন করতে থাকেন। কারণ, তারাও এর কাঁদাকাটি স্পষ্ট শোনেছিলেন।

উস্তুনে হান্নানাহসহ পবিত্র হুজরা শরীফের আশে-পাশে মোট ৭টি বিশেষ স্তম্ভ আছে। এগুলোর নাম ও বৈশিষ্ট্য হলো: ১। **উস্তুনে হান্নানাহ:** যে খেজুর শাখা ক্রন্দন করেছিল সেটা এর ভেতর রাখা আছে বা সেই স্থানের চিহ্ন। এর গায়ে লেখা আছে: **هٰذه أسطوانة المخلقة** । খালুক্ব নামক একটি আতর এই পিলারে লাগানো হয়েছিল। এজন্য

এটার অপর নাম হয়েছে **উস্তুনে 'আতর**। স্তম্ভের আরোও একটি নাম আছে। এটি **মুসহাফ** (**مصحف**) নামেও পরিচিত। ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ পবিত্র কুরআন শরীফের হারকাত সম্বলিত জিল্‌দ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন শহরে পাঠিয়েছিলেন। তিনি একটি মুসহাফ মদীনা শরীফেও পাঠিয়ে দেন। যে বাক্সে মুসহাফখানা ছিলো তা এই স্তম্ভের পাশে রাখা হয়েছিল। এজন্য পরবর্তীতে এটি '**উস্তুনে মুসহাফ**' নামে পরিচিত হয়।

২। **উস্তুনে হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা**: কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালে পবিত্র মিহরাবের বায়ে ঠিক পূর্ব-উত্তর কোণে অদূরে এটি অবস্থিত। এর গায়ে লিখা আছে, **هٰذه أسطوانة عائشة**। একটি হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়, হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার মসজিদে একটি বিশেষ স্থান আছে যার গুরুত্ব ও বরকত বিরাট। মানুষ যদি এটা সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে সকলেই এখানে নামায আদায়ের জন্য বেহুঁশ হতো।" [তাবারানী] হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা স্থানটি সম্পর্কে গোপনে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বলে দেওয়ার পর তা সবার জানাজানি হয়ে যায়।

৩। **উস্তুনে হযরত আবু লুবাবাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু**: এটা উস্তুনে হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে রওজা শরীফের দিকের পরবর্তী স্তম্ভ। এর গায়ে লিখিত আছে, **هٰذه أسطوانة أبي لبابة**। এটাকে **উস্তুনে তাওবাহ** নামেও সম্বোধন করা হয়। এই পিলারেই হযরত আবু লুবাবাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন। ঘটনাটি তাফসীরে ইবনে কাসিরে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইহুদি গোত্র বনী কুরাইজার বিশ্বাসঘাতকতা, বে-ঈমানী ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা দমনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামসহ তাদের দুর্গ ঘেরাও করেন। দীর্ঘ **২১** দিন পরে বনী কুরাইজা সিরিয়া যেতে প্রস্তাব দেয় এবং হযরত আবু লুবাবাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে মধ্যস্থতার জন্য নির্বাচন করে। উল্লেখ্য তাঁর বাড়ি ইহুদিদের এলাকায় ছিল। বনী কুরাইজা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, দূর্গ থেকে এমনিতেই যদি আমরা বেরিয়ে আসি তাহলে আমাদের পরিণতি কি হবে? তিনি হাতের ইশারায় 'গলা কাটা যাবে' সম্বোধন করলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি বুঝতে পারলেন, এ কথাটি তাদেরকে বলা উচিত হয় নি। কারণ, এরূপ বলা যুদ্ধের নিয়মবহির্ভূত কাজ- এটা গোপন কথা ফাঁসের শামিল। সুতরাং তিনি মসজিদে নববীতে এসে ভুলের

খেসারত দিতে যেয়ে নিজেকে উক্ত স্তম্ভের মধ্যে বেঁধে ফেললেন এবং বললেন, "আল্লাহ পাক আমার তাওবাহ কবুল না করা পর্যন্ত আমি এভাবেই থাকবো।" দীর্ঘ ৭ দিন ও ৭ রাত এভাবে চলে গেল। হযরত আবু লুবাবাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু খানাপিনা ছেড়ে আল্লাহর দরবারে কাঁদতে থাকেন। মাঝে-মধ্যে দুর্বলতা হেতু তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। এদিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি যদি নিজেকে এভাবে না বেঁধে আমার কাছে এসে সুপারিশ করতেন তাহলে আমি তাঁর জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করতাম। কিন্তু এখন ব্যাপারটি একমাত্র আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। ৭ দিন পর ভোরে ওহী নাযিল হল। এসময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মত জননী হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহার কক্ষে ছিলেন। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বদন মুবারক হাস্যোজ্জ্বল দেখে প্রশ্ন করলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! কি ব্যাপার? আপনাকে বড় খুশি দেখছি যে।" তিনি জবাব দিলেন, "আবু লুবাবাহর তাওবাহ আল্লাহ পাক কবুল করেছেন।" উম্মত জননী অনুরোধ করলেন, "তাহলে এই সুসংবাদটি কি আমি তাকে জানিয়ে দেব?" তিনি জবাব দিলেন, "এতে যদি তুমি আগ্রহী হয়ে থাকো তাহলে কেন দেবে না।" হযরত সালামা রাদ্বিআল্লাহু আনহা তখন কক্ষের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আবু লুবাবাহ! তোমার চেষ্টা স্বার্থক হয়েছে, আল্লাহ পাক তোমার তাওবাহ কবুল করেছেন।" উল্লেখ্য তখন পর্যন্ত পর্দার নির্দেশ আসে নি। এই সুসংবাদে অনেকে আবু লুবাবাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকটে যেয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানাতে লাগলেন এবং বন্ধনমুক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু নিজেকে মুক্ত করতে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে আমাকে মুক্ত করবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এভাবেই থাকবো।" সুতরাং পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযরের নামাযের সময় নিজের হাত মুবারক দিয়ে আবু লুবাবাকে বন্ধনমুক্ত করলেন।

৪. উস্তুনে সারীর (বিছানা স্তম্ভ): এটা হযরত আবু লুবাবাহ (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) স্তম্ভের ঠিক পূর্বে রওজা শরীফের দেওয়াল সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। এই পিলারের গায়ে লিখিত আছে, هٰذه أسطوانة السرير। এখানে নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিক্বাফ পালনকালে বিছানা বিছিয়ে ঘুমোতেন।

৫. উস্তুনে হারিস (পাহারাদার স্তম্ভ): এটা উস্তুনে সারীর থেকে সোজা উত্তরে রওজা শরীফের বর্তমান পশ্চিম দেওয়াল সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। এর গায়ে লিখিত আছে, هٰذه

أسطوانة الحارس। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাহারাদার এখানে দাঁড়াতেন।

৬. উস্তুনে ওয়াফুদ (প্রতিনিধি স্তম্ভ): উস্তনে হারিস থেকে উত্তর দিকের পরবর্তী যে স্তম্ভটি আছে সেখানেই এটার স্থান। এই স্তম্ভের গায়ে আরবীতে লিখা আছে, هٰذه أسطوانة الوفود। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বসে প্রতিনিধিদেরকে অভ্যর্থনা জানাতেন। এ স্থানে বিশিষ্ট সাহাবীরাও বসতেন।

৭. কবরের চতুর্ভুজ স্তম্ভ: এটা হুজরা শরীফের দেওয়ালের ভেতরে অবস্থিত। সুতরাং বাইর থেকে এটা এখন দেখা যায় না। উস্তনে ওয়াফুদ থেকে ঠিক পূর্বে এটির স্থান। এই জায়গার অপর নাম হলো মাক্বামে জিব্রাঈল আলাইহিসসালাম। এখানে তিনি এসে অবস্থান করতেন। স্থানটি হযরত আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহার হুজরা শরীফের এক কোণে অবস্থিত।

বর্তমান মিহরাবটি যেখানে ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে ইমামতি করেন, তা মসজিদের দক্ষিণের দেওয়ালে অবস্থিত। এটা হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মিহরাব। রওজা শরীফ সংলগ্ন পশ্চিমের কিছু জায়গায় ক্রিম রংয়ের কার্পেট বিছানো আছে। এরূপ গালিচা মসজিদের আর কোথাও নেই। জায়গাটির চতুর্দিকের সীমানার পিলারগুলোও অন্যান্যগুলো থেকে ভিন্ন। এই স্থানটিই হচ্ছে রিয়াজুল জান্নাহ বা বেহেশতের টুকরো। এরপর রওজা শরীফের সামনে এসে দাঁড়ানোর পর প্রথম যে গেট পরিদৃষ্ট হয়, তা হলো হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম-এর কবরের জন্য শূন্যস্থান। এর পরেরটি হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর মুবারক। তারপর শেষের গেট বরাবর আছে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কবর। বাবুস্‌ সালাম থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওজা শরীফ পর্যন্ত রাস্তাটির ডানের দেওয়ালে সর্বত্র কুরআনের আয়াতমালা এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে বিভিন্ন নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখিত আছে। এছাড়া রওজা শরীফের কক্ষটির দেওয়ালেও অনেক আয়াত ও নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখিত আছে। কোন কোন স্থানে পুরনো লেখার উপর নতুন লেখা চোখে পড়লো। একজন লোককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম শেখ সাদী (রহঃ)-এর রচিত প্রখ্যাত কবিতা "বালাগ্বাল

উলা বি কামালিহী... ...” লেখাটি অপর আরেকটি লেখার নীচে পড়ে গেছে। তবে লেখাটি ঠিক কোন্ জায়গায় আছে তা খুঁজে পাই নি।

হুজরা শরীফের উত্তরে (রওজা মুবারকের পেছন দিকে) উঁচু দু’টি জায়গা আছে। এর প্রথমটি (হুজরা শরীফের উত্তরের দেওয়াল থেকে কিছুটা বাইর পর্যন্ত বিস্তৃত) হচ্ছে মিহরাবে তাহাজ্জুদের স্থান। তবে মিহরাবটি দেখা যায় না। কর্তৃপক্ষ তা একটি পিতলের কুরআন শরীফ রাখার কেবিনেট দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। এ স্থানের ঠিক উত্তরের উঁচু স্থানটি হচ্ছে আসহাবে সুফ্‌ফার অংশ। আসহাবে সুফ্‌ফার সাহাবীরা (রাদ্বিআল্লাহু আনহুম) এখানে বসেই জ্ঞানচর্চা করতেন। এরা পেয়ারে নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাহাব্বাতের একেকজন উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ ছিলেন। বর্ণিত আছে, এরা সর্বদাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সান্নিধ্যে থেকে জীবন কাটিয়েছেন। জ্ঞানান্বেষী এই সাহাবীরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একান্ত আদরেরও ছিলেন। তিনি তাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তিকালের পর এরা বিভিন্ন দেশে গিয়ে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। ইসলামের জন্য তাদের অনেককে প্রাণও বিসর্জন করতে হয়েছিলো। বীরে মাউনা নামক স্থানে এই দলের ৭০ জন নির্দোষ জ্ঞানতাপসকে কাফিররা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলো। এ মর্মান্তিক ঘটনাটি সীরাতগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আসহাবে সুফ্‌ফার সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মতো প্রখ্যাত সাহাবীও ছিলেন।

সুফ্‌ফা-সংলগ্ন পূর্বদিকের দেওয়ালে একটি পুরনো বড় ফ্রেম চোখে পড়লো। ফ্রেমের ভেতর অনেককিছু আরবীতে লেখা আছে। একজন স্থানীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, এতে আসহাবে সুফ্‌ফার অনেক সাহাবীদের নাম লিখিত আছে। তবে এ ব্যাপারে চুড়ান্ত কোন প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। রওজা শরীফের উত্তরের দেওয়ালে একটি ছবিও দেখতে পেলাম। ছবিটিতে কাবা শরীফ ও মসজিদুল হারাম অঙ্কিত আছে, তবে কোনো মানুষ বা জীবজন্তুর ছবি নেই। দেখতে পুরনো মনে হলো। বাস্তবে এ ছবিটি কোন্ আমলের কিংবা এখানে এটা অঙ্কিত থাকার কারণ কি তা আমি জানতে পারি নি।

মসজিদে নববীর ভেতর রওজা শরীফের অদূরে দু’টি উন্মুক্ত জায়গা আছে। বর্তমানে জায়গা দু'টো ইলেকট্রিক ছাতা দ্বারা ঢাকা হয়। এই ছাতাগুলো যখন বন্ধ করা হয় তখন এগুলোকে সুন্দর পিলারের মতো দেখায়। একাধিকবার এগুলো খোলা ও বন্ধ হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করেছি। এখন অনুরূপ ছাতা মসজিদের বাইরের চতুর্পাশ্বস্থ চত্তরে লাগানো হয়েছে।

মসজিদে নববীর ভেতর দু'টি লাইব্রেরীও আছে। একজন লোককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, অতীতে এসব পাঠাগারের একটিতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সীলসহ কিছু ঐতিহাসিক বস্তু রক্ষিত ছিলো। কিন্তু মানুষের ভীষণ ভিড় হয় তাই এগুলো এখান থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। ছোট্ট এই লাইব্রেরীগুলোর ভেতর শুধুমাত্র আরবী বই-পুস্তক চোখে পড়লো। আমি যেটিতে ঢুকেছিলাম, সে লাইব্রেরী কক্ষের দরজার পাশে একটি বড় খাতা রাখা হয়েছে। এটিতে ভিজিটররা স্বাক্ষর করে থাকেন। আমি নিজেও একটি স্বাক্ষর করেছি।

একনজরে মসজিদে নববী

মসজিদে নববী সম্পর্কে উপর্যুক্ত তথ্যাদি ব্যক্তিগত চেষ্টায় উদ্ধার করেছি। এবার ইতিহাস গ্রন্থে প্রাপ্ত আরও কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

প্রয়োজনে সম্প্রসারণ ও মেরামতঃ হিজরী প্রথম সনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রথম নির্মিত হওয়ার পর এ যাবৎ মসজিদে নববী মোট ৯ বার সম্প্রসারণ ও মেরামত করা হয়েছে। যথা:-

১। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রথম সম্প্রসারণ: ৭ হিজরী। এ সময় মসজিদের দৈর্ঘ্য ১৫ মি. ও প্রস্থ ২০ মি. বর্ধিত করা হয়। মোট ক্ষেত্রফল দাঁড়ায় ৫০*৫০ = ২,৫০০ স্কোয়ার মিটার।

২। খলীফা হযরত উমর ফারুক রাদ্বিআল্লাহু আনহু কর্তৃক দ্বিতীয় সম্প্রসারণ: ১৭ হিজরী। এ সময় উত্তর দিকে ৫ মি., দক্ষিণ দিকে ১৫ মি. এবং পশ্চিম দিকে ১০ মিটার বর্ধিত করা হয়। এছাড়া ছাদের উচ্চতাও ৫.৫ মিটার বাড়ানো হয়। তখন মসজিদের ক্ষেত্রফল দাঁড়ায় ৭৫*৬০ মিটার = ৪,৫০০ স্কোয়ার মিটার।

৩। খলীফা হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু কর্তৃক তৃতীয় সম্প্রসারণ: ২৯ হিজরী। তিনি উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে ৫ মিটার করে বর্ধিত করেন। এর ফলে মসজিদের ক্ষেত্রফল হয় ৮৫*৬৫ = ৫,৫২৫ স্কোয়ার মিটার।

৪। উমাইয়্যা খলীফা ওয়ালিদ কর্তৃক চতুর্থ সম্প্রসারণ: ৮৮ হিজরী। তখন মদীনা মুনাওয়ারার শাসনকর্তা ছিলেন হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। খলীফার নির্দেশে তিনি মসজিদকে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ১০ মিটার করে বর্ধিত করেন।

৫। আব্বাসী খলীফা মাহদী কর্তৃক পঞ্চম সম্প্রসারণ: ১৬১-১৬৫ হিজরী। এসময় খলীফার দূত আব্দুল্লাহ বিন আসিম বিন উমর বিন আব্দুল আজিজ দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ করেন।

৬। অগ্নিকাণ্ডঃ মসজিদে নববী মোট দু'বার অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়। প্রথমবার আগুন ধরে ৬৫৪ হিজরীর ১লা রমজানের রাতে। বছরের ভিতরেই আব্বাসী খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ মেরামত কার্য সম্পাদন করেন। দ্বিতীয়বার আগুন লেগেছিল ৮৮৬ হিজরী সনে। এ বছর ১৩ই রমযান মুয়াজ্জিন শামসুদ্দীন মিনারে অবস্থানকালে হঠাৎ প্রচণ্ড বজ্রপাতে মিনারটি পুড়ে যায়। মুয়াজ্জিন শামসুদ্দীন সাথে সাথেই মৃত্যুবরণ করেন। আগুনে ছাদসহ বেশ কিছু জায়গা ভস্মীভূত হয়। সুলতান ক্বাইতাবাই ৮৮৮ হিজরীতে ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদ পুনঃনির্মাণ করেন।

৭. তুর্কি সুলতান আব্দুল মজিদ কর্তৃক সম্প্রসারণঃ ১২৬৫-১২৭৭ হিজরী। এ সময় মসজিদের আয়তন শুধু বৃদ্ধি হয় নি, দীর্ঘ তিন বছরে পুরো মসজিদকে আরবী ক্যালিগ্রাফি (লিপিকলা) এবং ইসলামী কারুকার্য দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। এসব কাজের দায়িত্বে ছিলেন প্রখ্যাত তুর্কি ক্যালিগ্রাফার (চারুলিপিকর) আব্দুল্লাহ জুহদী আফান্‌দী।

৮. প্রথম সৌদি সম্প্রসারণঃ ১৩৬৮-১৩৭৫ হিজরী। এ সম্প্রসারণের কাজ বাদশাহ আব্দুল আজিজ শুরু করেন এবং শেষ করেন বাদশাহ সৌদ বিন আব্দুল আজিজ। তুর্কি ও প্রথম এই সৌদি সম্প্রসারণ পরে মসজিদের মেঝের মোট ক্ষেত্রফল দাঁড়ায় ১৬,৩২৬ স্কোয়ার মিটার। এসময় মসজিদের ভেতর মোট ২৮,০০০ মুসল্লি একসাথে নামায আদায় করতে পারতেন।

৯. দ্বিতীয় সৌদি সম্প্রসারণঃ ১৪০৫ হিজরী (২ নভেম্বর ১৯৮৪) - ১৪১৪ হিজরী (১৫ এপ্রিল ১৯৯৪)। এই সম্প্রসারণের ফলে মসজিদে নববী বিরাট আকার ধারণ করে। এর ফলে নামাযের বিভিন্ন স্থানের মোট ক্ষেত্রফল হয়েছেঃ (ক) মেঝে = ৯৮,২৩৬ স্কোয়ার মিটার, (খ) ছাদ = ৬৭,০০০ স্কোয়ার মিটার এবং (গ) নামাযের জন্য মোট ক্ষেত্রফল ১,৫৬,৫৭৬ স্কোয়ার মিটার। মসজিদে নববীতে বাইরের কোর্টইয়ার্ড ছাড়াও মোট ২,৭০,০০০ মুসল্লি এক সঙ্গে নামায আদায় করতে পারেন। আর মসজিদের চতুর্দিকে নামাযের জন্য উপযোগী খোলা যে কোর্টইয়ার্ড আছে তার ক্ষেত্রফল হলো ২,৩৫,০০০ স্কোয়ার মিটার। সুতরাং যে কোন এক সময় মোট ৬,৯৮,০০০ মুসল্লি একসাথে নামায আদায় করতে পারেন।

সরানো যায় এমন গম্বুজঃ মসজিদের ছাদে মোট ২৭টি সরানো যায় বা খোলা যায় এমন গম্বুজ আছে। এগুলো খোলা কিংবা বন্ধ করার সময় কোন শব্দ হয় না। প্রতিটি গম্বুজ কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ গম্বুজগুলো অত্যন্ত সুন্দর এবং প্রতিটি ২.৫ কিলোগ্রাম স্বর্ণ দ্বারা কারুকার্য করা হয়েছে।

ছাদে আরোহণের চলন্ত ও সাধারণ সিঁড়ি: সর্বমোট ৬টি ইলেকট্রিক চলন্ত সিঁড়ি এবং ১৮টি সাধারণ সিঁড়ির মাধ্যমে মুসল্লিরা ছাদে ওঠা-নামা করেন।

মিনার: মসজিদে নববীর মিনারগুলো সত্যিই চিত্তাকর্ষক। দ্বিতীয় সৌদি সম্প্রসারণের সময় ৬টি নতুন সুউচ্চ মিনার তৈরি করা হয়। এদের প্রতিটি ১০৪ মিটার লম্বা। এ নিয়ে মোট মিনারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০টি।

বেইসমেন্ট: মসজিদে নববীর চতুর্দিকে দু'টি ফ্লোরে বিরাট বেইসমেন্ট তৈরি করা হয়েছে। এতে কার পার্ক, পুরুষ ও মহিলাদের ব্যবহারের জন্য টয়লেট এবং অযুর ব্যবস্থা আছে। সর্বমোট টয়লেটের সংখ্যা ৫০৪০টি। কার পার্কে একই সাথে ৪,৫০০ গাড়ি পার্ক করে রাখা যায়।

মার্বেলের তৈরি পিলার: মসজিদে নববীতে মার্বেলের তৈরি মোট পিলার সংখ্যা হলো ২,১৭৫টি।

সিসিটিভি ক্যামেরা: আধুনিক যুগে মসজিদে নববীকে অনাকাঙ্ক্ষিত সন্ত্রাসী হামলা কিংবা কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা থেকে রক্ষার্থে সৌদি সরকার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্থানে লাগানো হয়েছে ৫৪৩টি সিসিটিভি ক্যামেরা।

পরিচ্ছেদ ৮

মদীনা শহরের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ

মদীনা শহরে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানসমূহ আমাদের কাফেলার সকলে একদিন জিয়ারত করেছি। নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরলাম।

১. জান্নাতুল বাকী

মসজিদে নববীর অদূরে পূর্বদিকে বিখ্যাত জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থান অবস্থিত। উঁচু দেওয়ালবেষ্টিত এই বিরাট কবরস্থানটি প্রত্যহ বাদ আসর জিয়ারতের জন্য খুলে হয়। শুধুমাত্র পুরুষরা ভেতরে ঢুকতে পারেন। মহিলারা বাইর থেকে জিয়ারত করে থাকেন।

জান্নাতুল বাকীতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আত্মীয়-স্বজন এবং অনেক সাহাবায়ে কিরামের কবর আছে। এছাড়া তাবিঈন, তাবে তাবিঈন, প্রখ্যাত মুফাস্সীর, ইমাম, ওলিআল্লাহ এবং সাধারণ মুসলমানদেরও প্রচুর কবর এখানে বিদ্যমান। এখনও অনেককে এই কবরস্থানে দাফন করা হয়।

আমাদের কাফেলার প্রধান জনাব ক্বারী উবায়দুল্লাহ সাহেব অনেকগুলো কবরের পরিচিতি আমাদেরকে বলে দেন। কবরগুলোর শির বরাবর এক-একটি পাথর আছে মাত্র। কোনটিতেই লিখিত কিছু নেই। অবশ্য প্রখ্যাত সাহাবী এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কবরের চতুর্দিকে দেওয়াল আছে। এছাড়া এগুলোতে একেকজন লোক নিয়োজিত আছেন। এদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা কবরের পরিচিতি বলে দেন।

ভেতরে ঢুকেই ডান পার্শ্বে হযরত ফাতিমাতুজ্ জাহরা রাদ্বিআল্লাহু আনহা, হযরত হাসান বিন আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত ইমাম জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত জয়নব রাদ্বিআল্লাহু আনহা, হযরত রুকাইয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহা ও হযরত উম্মে কুলসুম রাদ্বিআল্লাহু আনহা, উম্মত জননী আয়িশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য পবিত্রাত্মা স্ত্রীসহ তাঁর আহল-আওলাদদের কবর দেখতে

পাওয়া যায়। এছাড়া আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ছোট্ট কবরটি দেখতে পাই।

কবরস্থানে ঘুরে বেড়াবার জন্য কয়েকটি পাকা রাস্তা আছে। বামদিকে গিয়ে আমরা একটি গণকবর দেখতে পেলাম। এটি একটি পুরাতন দেওয়ালের ভেতর অবস্থিত। এটা 'শুহাদা হাররা' নামে প্রসিদ্ধ। এখানে কয়েকজন শহীদকে একত্রে দাফন করা হয়েছিল। এরপর চোখে পড়ল তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কবর। এখান থেকে অদূরেই হযরত হালিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহার কবর। আমরা এক স্থানে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম নাফি' রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কবরও পাশাপাশি দেখতে পেলাম। এছাড়া আরও প্রসিদ্ধ সাহাবাদের মধ্যে যারা জান্নাতুল বাকীতে শায়িত আছেন তাঁদের মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'জন ফুফু বিবি আতিকা ও বিবি সাফিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা, হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মাতা হযরত ফাতিমা বিনতে আসআদ রাদ্বিআল্লাহু আনহা, হযরত আকীল বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ বিন জাফর বিন আবু তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত উসমান বিন মাযউন রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত খুনায়স বিন হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত আবু সাই'দ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত আব্দুর রাহমান বিন আউফ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত আসআদ বিন জুরারাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত সা'দ বিন মুআ'জ রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এক বর্ণনা মতে জান্নাতুল বাকীতে অন্তত ১০ হাজার সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের কবর আছে। যুগ যুগ ধরে এখানে সমাহিত হয়ে আসছেন আল্লাহর অসংখ্য ওলিআল্লাহ। পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষের দু'জন খ্যাতিমান ওলিও এখানে সমাহিত হয়েছেন। এরা হচ্ছেন হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী ও তাঁর খলিফা হযরত জাকারিয়া কান্ধলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা।

জান্নাতুল বাকীর পূর্বদিকে সাধারণ মুসলমানদেরও অসংখ্য কবর আছে। কবরের জায়গাটুকুতে মাটির স্তুপ আছে এবং প্রায় সবগুলোর শির বরাবর এক খণ্ড পাথর মাটির মধ্যে পুঁতে রাখা হয়েছে। তবে কার কবর কোন্‌টি তা জানার কোন উপায় নেই। কারণ কবরে কোন শিলালিপি নেই। প্রতিটি কবরের শিরই রওজা শরীফ বরাবর অর্থাৎ পশ্চিম দিকে। আমি কয়েকটি খনন-করা কবরও দেখেছি।

সবগুলো কবর ছিল বগলি ধরনের। এসব কবরে প্রতিদিনই অনেক সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে দাফন করা হয়।

২. মসজিদে কুবা ও মসজিদে জুমু'আ

এ দু'টি মসজিদ একটা আরেকটা থেকে অতি নিকটে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের সময় মদীনা শহরে প্রবেশের পূর্বে কুবা পল্লীতে কোনো কোনো রিওয়ায়েত মতে, ১২ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন। এখানে থাকাকালে তিনি ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ 'মসজিদে কুবা' নির্মাণ করেছিলেন। এরপর সর্বপ্রথম যে মসজিদটিতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর নামায আদায় করেছিলেন সেটি বর্তমানে 'মসজিদে জুমু'আ' নামে পরিচিত। মসজিদে কুবায় অনেক লোকের ভিড় থাকে। এখানে দু' রাকআ'ত নামাজ পড়া সুন্নাত। এ কারণে মদীনা মুনাওয়ারায় যারাই জিয়ারতে যান তারা এ মসজিদে এসে নামায পড়ে থাকেন।

২. হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বাড়ি

প্রখ্যাত এই দু'জন সাহাবীর বাড়ির নিদর্শন এখনও মদীনা শহরে বিদ্যমান। আমরা গাড়ি থেকে না নেমেই এ বাড়ি দু'টো অবলোকন করেছি। হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বাড়ির বিভিন্ন দেওয়াল এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তবে কালের স্রোতে দেওয়ালগুলো অনেকটা ভেঙ্গে পড়েছে। দেওয়ালগুলো রৌদ্রে শুকনো ধূসর রংয়ের ইট দ্বারা নির্মিত।

হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বাড়ির বাইর বাউণ্ডারীর দেওয়ালগুলো এখনও আছে। বাড়ির ভেতর অসংখ্য খেজুর বৃক্ষ। তবে মূল বাড়ির পুরনো কোনো দালান-অট্টালিকা আমার চোখে পড়ে নি। একটি বাড়ি আছে, তবে তা কত বছরের পুরনো সঠিকভাবে বলা যাবে না। বাড়ির সামনে একটি নোটিশে "ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি" লেখা দেখতে পেলাম।

৩. শুহাদায়ে উহুদ

মদীনা শরীফের অদূরে উহুদ পাহাড়ের নিকটে হযরত হামযা রাদ্বিআল্লাহু আনহুসহ অনেক শহীদ সাহাবী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের কবর অবস্থিত। উহুদের যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শাহাদাতবরণ করেছিলেন। এদের প্রায় সকলকেই এখানে কবর দেওয়া হয়। বর্তমানে কবরস্থানটি একটি উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। তবে একদিকে গ্লাসের জানালা আছে। ভেতরের কবরগুলো দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ দিক থেকেও কবরগুলো দৃশ্যমান। কবরস্থানের সমতল জায়গা থেকে অদূরেই একটি ছোট্ট টিলা। এ টিলায় আরোহণ করে সমস্ত এলাকাটি ভালো করে অবলোকন করা যায়। অনেকেই বললেন, এ টিলার পেছন থেকেই পরবর্তীতে ইসলামের বীর সৈনিক খালিদ ইবনে ওয়ালিদ মুসলমানদেরকে আক্রমণ করেন। এ আক্রমণের সম্ভাবনা আঁচ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই একদল তীরন্দাজকে এই স্থানটি রক্ষার্থে নিয়োজিত করে রাখলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এক পর্যায়ে দেখা গেল কুরাইশরা হেরে যাচ্ছে। তখন কয়েকজন ছাড়া এই তীরন্দাজদের অধিকাংশ গণিমতের মাল লুণ্ঠনের লক্ষ্যে নিজ স্থান থেকে চলে আসলেন। এদিকে খালিদ ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছিলেন। তীরন্দাজরা চলে যাওয়ার পরই তিনি পেছন দিক থেকে তুমুল আক্রমণ করলেন। এরফলে অনেক মুসলমানরা শহীদ হলেন। এছাড়া পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর কুরাইশরা আক্রমণ করে তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিলো। অনেক মুসলমান এসময় তাঁকে রক্ষার্থে নিজের শরীর ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে শাহাদতবরণ করেন। তথাপি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ যোদ্ধাদের আঘাতে আহত হলেন, তাঁর দন্ত মুবারক শহীদ হলো। প্রচণ্ড আঘাতে মাথা মুবারক থেকে রক্ত ঝরলো।

এখানে এসে এসব কথা মনে পড়তেই চোখ দু'টো অশ্রু সিক্ত হলো। শরীরে জেগে উঠলো শিহরণ। আজো যেন সেদিনের তুমুল লড়াইয়ের প্রতিধ্বনি হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে তরবারির ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ। ইসলামের জন্য এতো ত্যাগ, এতো কষ্ট করেছেন পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবন পর্যন্ত সেদিন হুমকির সম্মুখীন হয়েছিলো। আজকের মুসলমানরা এ ইতিহাস থেকে গাফিল।

অমুসলিমদের নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা আর খুন-খারাবির শিকার মুসলিম উম্মাহ্‌। কিন্তু কোথায় গেল উহুদের চেতনা, কোথায় গেল জিহাদী জয্‌বা? মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন জাগ্রত হলো। ভাবলাম, হায়! মুসলমানরা কবে আবার জেগে উঠবে উহুদের প্রেরণায়?

৪. মসজিদে কিবলাতাইন

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযের কিবলা ছিলো জেরুজালেমের মসজিদে আকসা। এ মসজিদেই মসজিদে আকসা থেকে কাবা শরীফের দিকে কিবলা পরিবর্তন হয়েছিলো। এ কারণে এটাকে মসজিদে কিবলাতাইন বা দুই কিবলার মসজিদ বলা হয়। কিবলা পরিবর্তনের ঘটনাটি বিভিন্ন সীরাতগ্রন্থে নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে।

তখন হিজরী ২য় সনের শা'বান মাস। একদা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মসজিদে নামায পড়ছিলেন। তিনি এক পর্যায়ে বার বার উপরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী নাজিল হলো: "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ঊর্ধ্ব দিকে মুখ তুলে নামায পড়তে দেখেছি। সেজন্য আমি আপনাকে এমন একটি কিবলার দিকে মুখ ফেরাব, যাতে আপনি খুশী হবেন। অতএব আপনার মুখ মক্কার পবিত্র বাইতুল্লাহর দিকে ফেরান। তোমরা (হে মুসলমানরা) যেখানেই থাক না কেন, যখন প্রার্থনা করবে তখন তারই দিকে (কাবা ঘরের দিকে) মুখ ফেরাবে" [সূরা বাকারাহঃ ১৪৪]। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামাযে থাকাবস্থায়ই কাবা শরীফের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। সেই থেকে কাবা শরীফ মুসলমানদের কিবলায় পরিণত হলো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এটাই একমাত্র মসজিদ যেখানে একই নামাযে দু'টি কিবলার দিকে মুখ করে নামায আদায় হয়েছে। এজন্যেই এর নামকরণ হয়েছে 'দুই কিবলার মসজিদ'। মসজিদের ভেতর দু' রাকআ'ত নামায পড়া সুন্নাত। বর্তমানে অবশ্যই মিহরাবটি বাইতুল্লাহর দিকে কিবলা করে নির্মিত আছে, কিন্তু ঠিক কোন্‌দিকে বায়তুল মুকাদ্দাস তার কোন নিদর্শন বা চিহ্ন চোখে পড়ে নি।

৫. খন্দক ও সাত মসজিদ

মদীনা তথা ইসলামকে চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়ার নিমিত্তে বদর ও উহুদ যুদ্ধের পর কুরাইশরা শেষ পর্যন্ত আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ১০ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মহাবিপদ থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় সেজন্য সাহাবায়ে কিরামদের সঙ্গে একটি বৈঠক করে আলাপ করলেন। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিআল্লাহু আনহু পরামর্শ দিলেন সম্ভাব্য আক্রমণের দিকটিতে পরিখা (খন্দক) খনন করা হোক। তাঁর এই অভিনব পরামর্শে সকলেই রাজী হয়ে গেলেন। মদীনার তিন দিকে ঘরবাড়ি ও খেজুর বাগান ছিলো, এতে শহর রক্ষার কাজ হতো। একমাত্র সিরিয়ার দিকটি খোলা ছিলো, তাই পরিখা সেদিকেই খননের সিদ্ধান্ত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন হাজার সৈন্য নিয়ে পরিখা খননের কাজ শুরু করলেন। খনন-কার্যে তিনি নিজেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কাফিররা মদীনার উপকণ্ঠে এসে শহরে ঢুকতে না পেরে তাঁবু গাড়লো। এরপর প্রায় এক মাসব্যাপী তারা মদীনা শরীফকে অবরোধ করে রাখলো। এসময় মুসলমানরা এক মহাবিপদের সম্মুখীন হন। খাবার ও রসদ-পত্রের অভাবে সবাই কাতর হলেন। অনেককে ৭ দিন পর্যন্ত উপবাসে কাটাতে হয়েছে। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উপবাস করেছেন। এ প্রসঙ্গে সীরাতুন্নবী থেকে একটি করুণ ঘটনা বর্ণনা করছি।

পরিখা খননের এক পর্যায়ে এক বিরাট পাথর বেরিয়ে এলো। পাথরটি ভাঙ্গার প্রয়োজন দাঁড়ালো। ক্ষুধা ও দুর্বলতা হেতু কেউই তা ভাঙ্গতে সক্ষম হলেন না। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খবর দেওয়া হলো। তিনি এসে পাথরটিতে আঘাত হানলেন আর এমনিতেই তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তারপর দেখা গেল অনেক সাহাবার পেটে একটি করে পাথর বাঁধা ছিলো কিন্তু নবীজীর পেটে বাঁধা ছিলো দু'টি পাথর এবং তিনি গত তিনদিন যাবৎ অনাহারে আছেন! এই পরিখার যুদ্ধই ইতিহাসে **'খন্দক যুদ্ধ'** নামে পরিচিত।

বর্তমানে জাবাল সিল্‌আ নামক পাহাড়ের সম্মুখে অবস্থিত সেই পরিখার জায়গাটিতে ৭টি ছোট্ট মসজিদ দেখতে পাওয়া যায়। তবে এখানে পরিখার কোন

নিশানা নেই। আমি আমাদের কাফেলার প্রধানকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, সেই পরিখাটি অনেক আগেই ভর্তি হয়ে গেছে। ৭টি মসজিদের প্রতিটিই কাঁচা মটির তৈরী। এগুলো যে সে আমলের তা সহজেই অনুমান করা যায়। অনেককে মসজিদে নামায আদায় করতে দেখলাম। আমাদের হজ্জ কাফেলার দু'একজনও নামায আদায় করেছেন। ৭ মসজিদের ৫টি বর্তমানে পর্যটকদের জন্য খোলা থাকে। আমাদের অনেকেই এই পাঁচটি মসজিদ পরিদর্শন করেছি।

দ্রঃ সউদি কর্তৃপক্ষ খন্দক এলাকায় সম্প্রতি বড় একটি মসজিদ তৈরী করেছেন। খন্দকের ঐতিহাসিক মসজিদগুলোর দু' একটি মাত্র বিদ্যমান আছে।

শেষকথা

আমরা হজ্জ শেষে ৯ দিনের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা জিয়ারতে যাই। আগেই অনেক তথ্যসহ মদীনা শরীফের বর্ণনা কিছুটা ব্যক্ত করেছি। মদীনা মুনাওয়ারার স্মৃতিকথা ও অনুভূতির পুরো বৃত্তান্ত এ প্রসঙ্গে আর লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। ইতোমধ্যে লেখাটি বিরাট হয়ে গেছে। অবশ্য পেয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র রওজা জিয়ারত করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি। পবিত্র সোনার মদীনায় গিয়ে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মুবারকের পাশে দাঁড়িয়ে **'আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!'** বলে সালাম জানানোর আকাঙ্ক্ষা তো সারা জীবনের। আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ করে তাঁর এই গোনাহগারকে এ সুযোগ দান করেছেন। আমি কি কোনদিন এর শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবো? সোনার মদীনায় নিয়েও তিনি তাঁর রাহমাতের বারিধারা বর্ষণ করে আমাদেরকে সিক্ত করেছেন।
আল্লাহ্‌র করুণা, মাহাব্বাত ও দয়ার সীমা নেই। হে আল্লাহ্! দয়াকরে অচিরেই তুমি আবার মক্কা মুয়াজ্জমা ও সোনার মদীনা মুনাওয়ারায় যাওয়ার তাওফিক ও সৌভাগ্য দান করো। এ গ্রন্থের পাঠকদেরকেও তুমি সে অনুগ্রহের মধ্যে শামীল করো। আমীন।

পরিভাষা

বাইতুল্লাহ্‌র মেহমানদের সুবিধার্তে নিম্নে হজ্জ ও উমরাহ সম্পর্কিত কিছু পরিভাষা ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরছি। আশাকরি এ থেকে সকলে উপকৃত হবেন।

মীক্বাত (ميقات): মক্কা শরীফ থেকে বিভিন্ন দূরত্বে স্থাপিত ৫টি স্থান। এই স্থানগুলো বিনা ইহরামে অতিক্রম নিষিদ্ধ। যে কোন আফাকী (মীক্বাতের সীমানার বাইরের) মুসলমানকে মক্কা শরীফ যাওয়ার নিয়ত করলে এসব স্থানে পৌছে বা এর পূর্বে নিয়তসহ ইহরাম পরিধান করা ওয়াজিব।

জুহফা (الجحفه): মক্কা শরীফ থেকে ১৮২ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে স্থাপিত মীক্বাত। এটি সিরিয়া ও মিশর এবং এদিক থেকে আগত সকলের মীক্বাত।

জুল হুলাইফাহ (ذو الحليفه): মক্কা শরীফ থেকে ৪১০ কি.মি. উত্তরে এই মীক্বাত অবস্থিত। মদীনা মুনাওয়ারাবাসী এবং যারা এদিক থেকে মক্কা শরীফ গমন করেন এটা তাদের মীক্বাত। বর্তমানে এ স্থানকে **'আবইয়ার আলী'** বলে। এখানে একটি মসজিদ আছে। মসজিদে নববী থেকে এখানকার দূরত্ব ১০ কিলোমিটার।

যাতে ইরাক্ব (ذات عرق): ইরাক্ববাসী এবং যারা এদিক থেকে মক্কা শরীফ গমন করেন এটা তাদের মীক্বাত। হারাম শরীফ থেকে ৯০ কি.মি. উত্তর-পূর্বে এই মীক্বাত অবস্থিত।

কারনুল মানাযিল (قرن المنازل): এটি হারাম শরীফ থেকে ৮০ কি.মি. উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এটা নজদবাসী ও এদিক থেকে আগত যাত্রীদের মীক্বাত।

ইয়ালামলাম (يلملم): মক্কা শরীফ থেকে ১৩০ কি.মি. দক্ষিণে এই মীক্বাত অবস্থিত। এটা ইয়ামন ও ভারত উপমহাদেশসহ এদিক থেকে আগত সকল যাত্রীদের মীক্বাত। বর্তমানে এই স্থানকে **সাদিয়া** বলে।

ইহরাম (إِحْرَام): এর অর্থ নিজেকে কিছু হালাল কাজ থেকে বিরত রাখা কিংবা হারাম করা। হজ্জ, উমরাহ বা উভয়ের নিয়ত করে নিলেই ইহরামের ভেতর ঢুকা হয়ে যায়।

সুতরাং এ অবস্থায় বেশ কিছু হালাল জিনিস ও কাজ হারাম হয়ে যাবে। পারিভাষিক অর্থে 'ইহরাম' মানে বিশেষ কাপড় পরিধানও বটে।

মুহরিম (مُحْرِمٌ): যে ইহরাম অবস্থায় থাকে তাকে মুহরিম (ইহরামওয়ালা) বলে।

আফাকী (افافي): মীক্বাতের বাইরে বসবাসকারী।

হিল (حل): হারাম শরীফের সীমানার বাইর কিন্তু মীক্বাতের ভেতরের স্থান।

আহলে হিল (اهل حل): যারা হিল এলাকায় বসবাস করেন।

হারাম (حرم): মক্কা শরীফের চতুর্দিকের নির্দিষ্ট সীমানা। এই এলাকার মধ্যে অমুসলিমদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

আহলে হারাম (اهل حرم): হারাম শরীফের অভ্যন্তরে যারা বসবাস করেন।

মাক্কী (مكي): মক্কা শরীফের অধিবাসী।

আইয়্যামে তাশরিক (أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ): ৯ জিলহাজ্জ ফযর থেকে ১৩ জিলহাজ্জ আসরের নামায পর্যন্ত সময়। এ দিনগুলোতে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরিক পাঠ করা হয়।

আইয়্যামে নহর (ايام نحر): ১০ থেকে ১২ জিলহাজ্জ সময়। এই সময়ের ভেতর কুরবানী করতে হয়।

হাজ্জ (حَاجٌّ): ইহরাম পরে (নিয়ত করে) তাওয়াফ, সাঈ, উকুফে আরাফাহ, উকুফে মুজদালিফা, রামি, কুরবানী ইত্যাদি কার্য নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ নিয়মে পালন।

ইফরাদ (إِفْرَادُ): শুধুমাত্র হজ্জ পালনের নিয়তে ইহরাম পরিধান (নিয়ত)।

তামাত্তু' (تَمَتُّعُ): প্রথমে উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফ যেয়ে উমরাহ পালন করে হালাল হওয়া। এরপর মিনায় যাওয়ার প্রাক্কালে আবার হজ্জের নিয়তে ইহরাম বেঁধে যাবতীয় কাজ করা।

ক্বিরান (قِرَانٌ): উমরাহ ও হজ্জ পালনের নিয়তে ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফ যেয়ে উমরাহ সেরে মাথা না মুণ্ডিয়ে, ইহরাম অবস্থায় থাকা এবং হজ্জ পালন করা।

মুফরিদ (مفرد): ইফরাদ হজ্জ পালনকারী।

মুতামাত্তি (مُتَمَتِّعٌ): তামাত্তু হজ্জ পালনকারী।

ক্বারিন (قارن): ক্বিরান হজ্জ পালনকারী।

উমরাহ (عُمْرَةٌ): মীক্বাত (বা মক্কা শহরে থাকাবস্থায় মসজিদে তান'ঈম- তথা হিল) থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফ যেয়ে তাওয়াফ, সাঈ ও মাথা মুণ্ডানো।

তালবিয়াহ (تلبية): পূর্ণ লাব্বাইক পাঠ করা।

ইসতিলাম (اسْتِلَامٌ): হাজারে আসওয়াদ কিংবা রুকনে ইয়ামনীতে চুম্বন অথবা স্পর্শ করা।

ইজতিবা (إضطباع): তাওয়াফের পুরো ৭ চক্কর ইহরামের গায়ের টুকরো এমনভাবে রাখা যাতে ডান হাত ও কাঁধ উন্মুক্ত থাকে এবং বাম কাঁধ আবৃত হয়।

রমল (رمل): তাওয়াফের সময় প্রথম তিন চক্কর কাঁধ হেলে-দুলে বীরের মতো একটু দ্রুত হাঁটা।

মিনা (منى): মসজিদুল হারাম থেকে ৭ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত একটি ময়দান। হজ্জযাত্রীরা এখানে (স্থায়ীভাবে নির্মিত তাঁবুতে) ৮, ১১ ও ১২ জিলহাজ্জ রাতে অবস্থান করেন। কেউ কেউ ১৩ জিলহাজ্জ রাতেও থাকেন। মিনা হারাম সীমানার অভ্যন্তরে অবস্থিত।

ইয়াওমুত তারবিয়াহ (يَوْمُ التَّرْوِيَةِ): ৮ জিলহাজ্জ। এদিন হজ্জযাত্রীরা মিনা ময়দানে উপস্থিত হন।

মুজদালিফাহ (مُزْدَلِفَةٍ): মিনা ও আরাফাতের মধ্যবর্তী একটি ময়দান। মিনার জামারাতের স্থান থেকে এর দূরত্ব ৭ কিলোমিটার, মক্কা শরীফ থেকে ১২ কিলোমিটার। হজ্জযাত্রীরা ৯ জিলহাজ্জ দিবাগত রাত এখানে অবস্থান করেন। এখানেই মাশ'আরিল হারাম নামক মসজিদটি স্থাপিত হয়েছে। এই মাঠটি হারাম শরীফের সীমানার ভেতরে অবস্থিত।

ওয়াদী মুহাসসার (وَادِي مُحَسِّرٍ): মুজদালিফার নিকটস্থ একটি স্থান। এখানেই বাদশাহ আবরাহার আসহাবে ফীল বা হস্তিবাহিনীকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করেছিলেন। 'গজবের পাহাড়' নামে খ্যাত এই স্থানটি হাজ্জীরা দ্রুত অতিক্রম করেন।

'আরাফাত ([illegible]): মসজিদুল হারাম থেকে ২২ কি.মি. দূরে এই ময়দান অবস্থিত। ৯ জিলহাজ্জ হজ্জ পালনকারীরা এখানেই এসে উকুফ করেন। 'আরাফাত হারাম শরীফের বাইরে অবস্থিত।

মাসজিদে ইব্রাহীম (مسجد إبراهيم): আরাফাতের প্রধান মসজিদ। বর্তমান নাম **'মসজিদে নামিরাহ'**। উকুফ পালনকারীরা সতর্ক থাকা জরুরী। বর্তমান এই মসজিদের একাংশ আরাফাতের সীমানার বাইরে। সুতরাং উকুফ পালনকালে এই অংশে অবস্থান করা যাবে না।

ইয়াওমুল 'আরাফাত (يوم العرفات): ৯ জিলহাজ্জ। হজ্জের দিসব।

উকুফ (وقوف): অবস্থান বা অপেক্ষা করা। হজ্জের মওসুমে ৯ জিলহাজ্জ আরাফাতে ও এদিন দিবাগত রাত (১০ জিলহাজ্জের রাত) মুজদালিফায় উকুফ করতে হয়।

মাওয়াক্বিফ (مواقف): উকুফকারী (অর্থাৎ হজ্জপালনকারী)।

জামারাত (الْجَمَرَاتِ): মিনায় স্থাপিত তিনটি স্থানে কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য বিরাট বিরাট দেওয়াল ও সেঁতু নির্মিত হয়েছে। এই তিনটি স্থানের নাম জামারাত। মসজিদে খায়েফের নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত দেওয়ালকে বলে জামারাতুল উলা, মক্কা শরীফের দিকে এর পরেরটির নাম জামারাতুল উসতা এবং মক্কা শরীফের নিকটবর্তী দেওয়ালের নাম জামারাতুল কুবরা। এগুলোকে যথাক্রমে ছোট, মাঝারি ও বড় শয়তান বলে।

রামি (رمی): জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ।

হাল্‌ক্ব (حلق): মাথা মুণ্ডানো।

কসর (قصر): মাথার চুল ছাঁটা।

দম (دم): একটি বকরি কুরবানী। দমে শুকুর তামাত্তু ও কিরানকারীর জন্য ওয়াজিব। 'দম' ত্রুটি হেতু (ওয়াজিব তরক করলে) কাফফারা হিসাবেও আদায় করতে হয়।

জান্নাতুল মা'লা (جنة المعلى): মক্কা শরীফের প্রখ্যাত কবরস্থান। এখানে উম্মত জননী হযরত খাদিজা রাদ্বিআল্লাহু আনহাসহ অনেক সাহাবায়ে কিরাম, ওলি-আল্লাহ ও মুসলমানদের কবর আছে।

বাইতুল্লাহ্‌ (بَيْتُ الله): আল্লাহর ঘর। কাবা শরীফ।

হাজারে আসওয়াদ (حجر اسود): পবিত্র কাবা ঘরের দরোজার নিকটস্থ কোণে স্থাপিত কালো পাথর।

হাতিম (حاطم): পবিত্র কাবা ঘরের উত্তর-পশ্চিমের দেওয়াল সংলগ্ন অর্ধ-বৃত্তাকার একটি দেওয়ালঘেরা স্থান। অতীতে এই অংশটুকু বাইতুল্লাহ্‌র ভেতরে ছিলো।

মুতাফ (مطاف): বাইতুল্লাহ্‌র চতুর্পাশ্বস্থ তাওয়াফের ক্ষেত্র।

রুকনে হাজারে আসওয়াদ (ركن حجر اسود): হাজারে আসওয়াদ যে কোণে স্থাপিত। এটা কাবা ঘরের পূর্ব কোণ।

রুকনে শামী (ركن الشامي): কাবা ঘরের দক্ষিণ কোণ।

রুকনে ইরাক্বী (ركن العراقي): কাবা ঘরের পশ্চিম কোণ।

রুকনে ইয়ামনী (ركن اليماني): কাবা ঘরের উত্তর কোণ।

তাওয়াফ (طواف): হাজারে আসওয়াদের কোণ বরাবর থেকে শুরু করে কাবা ঘরের চতুর্দিকে ৭ চক্কর শেষে দু' রাকাআত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায আদায় করা।

শাওয়াত (شواط): কাবা শরীফের চতুর্দিকে একেকটি চক্কর একেকটি শাওয়াত।

মুলতাযিম (ملتزم): রুকনে হাজারে আসওয়াদ থেকে কাবা শরীফের দরোজা পর্যন্ত দেওয়াল ও সামনের স্থান। এখানে দু'আ কবুল হয়।

জমজম (زمزم): কাবা শরীফের নিকটস্থ কূপের পবিত্র পানি।

সাফা (الصَّفَا): কাবা শরীফের উত্তর দিকে সাফা পাহাড় অবস্থিত। এ পাহাড় থেকে সাঈ শুরু হয়।

মারওয়াহ (الْمَرْوَةِ): কাবা শরীফের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মারওয়াহ পাহাড় অবস্থিত। এখানে এসে সাঈ শেষ হয়।

সাঈ (سَعْي): সাফা ও মারওয়াহ পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে ৭ দৌড় দেওয়া।

বাতনে ওয়াদী (بَطْنِ الْوَادِي): সাফা ও মারওয়াহ পাহাড়ের মধ্যস্থ সবুজ বাতি দ্বারা চিহ্নিত কিছু জায়গা। এ জায়গাটুকু পুরুষদেরকে সাঈ পালনের সময় কিছুটা দৌড়ে পার হতে হয়।

উকুফে আরাফা (وُقُوف بِعَرَفَةَ): ৯ জিলহাজ্জ জাওয়াল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান। এটা হজ্জের তিন ফরযের একটি।

তাওয়াফে জিয়ারত (طَوَاف الزِّيَارَةِ): **১০** জিলহাজ্জ ভোর থেকে **১২** জিলহাজ্জ মাগরিবের পূর্বে যে কোন সময় এই তাওয়াফ করতে হয়। এটা হজ্জের তিন ফরযের একটি।

তাওয়াফে কুদুম (طَوَاف الْقُدُومِ): ইফরাদ ও ক্বিরান হজ্জযাত্রীদের জন্য মক্কা শরীফ পোঁছে এই তাওয়াফ করতে হয়। এটা সুন্নাত।

উকুফে মুজদালিফা (وُقُوف مُزْدَلِفَةَ): ৯ জিলহাজ্জ দিবাগত রাত আরাফাত থেকে এসে মুজদালিফায় থাকা। উকুফে মুজদালিফার সময় হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়। উকুফে মুজদালিফা ওয়াজিব।

রামি জিমার (رَمْيُ الْجِمَارِ): জামারাতে শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ। এটা ওয়াজিব।